
প্রতিদিন
১৭ জানুয়ারি ২০১০
রোববার
অবলম্বনে



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


অঞ্জলি
জুয়েলার্স
সবার জন্য
Mayurakshi/284/09
উপহার কেনা আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
জুয়েলারী ইনসেনটিভ স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ টাকা
বা তার বেশীর কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাস টাকা জমালে
১ মাস ফ্রি !!
* শর্তাবলী প্রযোজ্য।
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২
শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
দোকান রাত ৮.০০ পর্যন্ত খোলা।
www.anjali.bz
w.a anjali.

প্রতিদিন

রোববার

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকো চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।



২০০৯ শেষ হল মুম্বইয়ের এক চূড়ান্ত বক্স-অফিস হিট দিয়ে। থ্রি ইডিয়ট্‌স।

বিধুবিনোদ চোপড়া প্রযোজিত রাজকুমার হিরানি পরিচালিত এবং আমির খানের শীর্ষ ভূমিকায় অভিনয়-খচিত এই ছবিটি এক বিপুল সাফল্যের ছায়া ফেলেছে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। যুবামননের প্রতিটি সূক্ষ্ম অনুরণন এই ছবি জুড়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে মুগ্ধ করে চলেছে দর্শকদের।

আমি ছবিটি দেখেছি। তার গুণাগুণ, উৎকর্ষ-দুর্বলতা (আমার মতে অন্তত যা যা মনে হয়েছে) আলোচনার জন্য আজকের 'ফার্স্ট পার্সন' নয়।

সাম্প্রতিক কালে ইংরেজি উপন্যাস লিখে যুবজগতে কিছুটা নাড়াচাড়া ফেলেছেন যে যুবক গদ্যকার, চেতন ভগত—থ্রি ইডিয়ট্‌স ছবিটা 'নাকি' আদতে তাঁর 'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান' আশ্রিত। পাঠকরা একটু লক্ষ করবেন আগের বাক্যের 'নাকি' শব্দটা কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বেশি জরুরি।

ছবি মুক্তি পাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম—খবরের কাগজের পাতা জুড়ে ভীষণ বিতর্ক। চেতন ভগত দাবি করছেন মূল উপন্যাসটি, এবং সেহেতু প্রধান কাহিনিসূত্রটি, তাঁর কল্পনাপ্রসূত; ছবিতে কাহিনিকার হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। প্রযোজকরা তা না করে কাহিনিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন রাজকুমার হিরানি ও অভিজাত যোশিকে। প্রযোজকদের পক্ষ থেকে পাল্টা যুক্তি, ছবিটি মূল সাহিত্যকর্মের একটি ম্লান প্রচ্ছায়া মাত্র, ফলে কাহিনি যেহেতু উপন্যাস থেকে অনেক দূর সরে এসেছে—এই নবনির্মিত কাহিনির দাবিদার যথার্থভাবেই রাজকুমার হিরানি ও অভিজাত যোশি। চেতন ভগতের নাম ছবির অন্তিম চরিত্র-লিপিতে দেখা গিয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের নামও—এই ছবির 'ক্ষীণ অনুপ্রেরণা' হিসেবে।

তারপর লেখক আলাদা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, প্রযোজক-পরিচালক উভয়েই অনড় থেকেছেন নিজেদের অবস্থানে। চুক্তিপত্র, পারিশ্রমিক সব কিছু দিয়ে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে কাগজে-কলমে যে, চেতন ভগত 'থ্রি ইডিয়ট্‌স'-এর যতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছেন পর্দায়, কেবল ততটুকুই তাঁর প্রাপ্য। তার বাড়তিটুকুর জন্য পারিশ্রমিক তো আছেই।

বস্তুত ছবিটি উপন্যাসটি থেকে অনেকটা আলাদা—প্লটিং-এর দিক থেকে সম্পূর্ণ একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে ছবির কাহিনি বর্ণনায়, যা মূল উপন্যাসে অনুপস্থিত ছিল। অতএব ঔপন্যাসিকের অবদান এক্ষেত্রে গৌণ। পরিচালক, প্রযোজক সদম্ভে ছবিটিকে নিজেদের কাহিনি রচনা বলে দাবি করতে পারেন।

আমরা 'নষ্টনীড়' পড়েছি। আমরা 'চারুলতা' দেখেছি। আমরা 'অপরাজিত' পড়েছি এবং দেখেছি। এই দু'টি মহৎ চলচ্চিত্রের কাহিনি-রচয়িতারাও সমান মহৎ ছিলেন। একজন বিভূতিভূষণ, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এবং আমরা এ-ও দেখেছি, ছবিগুলি সিনেমার নিরিখে প্রায় প্রথম শ্রেণির Masterpiece হলেও, কোনও অর্থেই মূল সাহিত্যকর্মের সেলুলয়েড জেরক্স নয়।

আমি নিজে রবীন্দ্র উপন্যাস নিয়ে কাজ করেছি। যতদিন রবীন্দ্রনাথ কপিরাইট-বন্দি ছিলেন, বিশ্বভারতীর কড়া প্রহরার বাইরে তাঁকে নিয়ে কোনওরকম মুক্তির কথা ভাবাটাই প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশ্বভারতী সাধারণত এই 'মুক্তি'গুলিকে 'প্রক্ষেপণ' হিসেবে দেখতেন।

তারপরেও 'চারুলতা' তৈরি হয়েছে। যথেষ্ট মৌলিক প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কাহিনিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নামই গিয়েছে। সত্যজিৎ শিল্পীসুলভ বিনম্রতায় কেবল চিত্রনাট্যকার-এর ভূমিকাটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। পরে যখন তাঁর এই মৌলিক উপাদানগুলি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তিনি চিত্রনাট্যকারের জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। কখনও লেখকের আসনটি কায়েম করেননি।



সব সাহিত্যকর্মই সম্পূর্ণভাবে সিনেমা-অনুকূল নয়। সিনেমা অনুযায়ী, বা চলচ্চিত্রকারের চাহিদার সামনে সব সাহিত্যকারই মনে করেছেন যে, তাঁর মূল রচনার কিছু না কিছু অঙ্গহানি ঘটেছে—কিন্তু তা হলেও তিনি কাহিনির মূল স্রষ্টা। এ নিয়ে কোনও বিতর্ক ওঠেনি।

'অপরাজিত' থেকে লীলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে কাহিনিটি আর বিভূতিভূষণের রইল না এমন দাবি সত্যজিৎকে তো কখনও করতে শুনিনি। এমনকী, 'দেবী' ছবির প্রথমে আমরা দেখতে পাই আদত কাহিনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর এই উদ্ধৃতি যে, এই কাহিনির মূল আখ্যানভাগ রবীন্দ্রঠাকুর মহাশয় তাঁকে দান করেছিলেন।

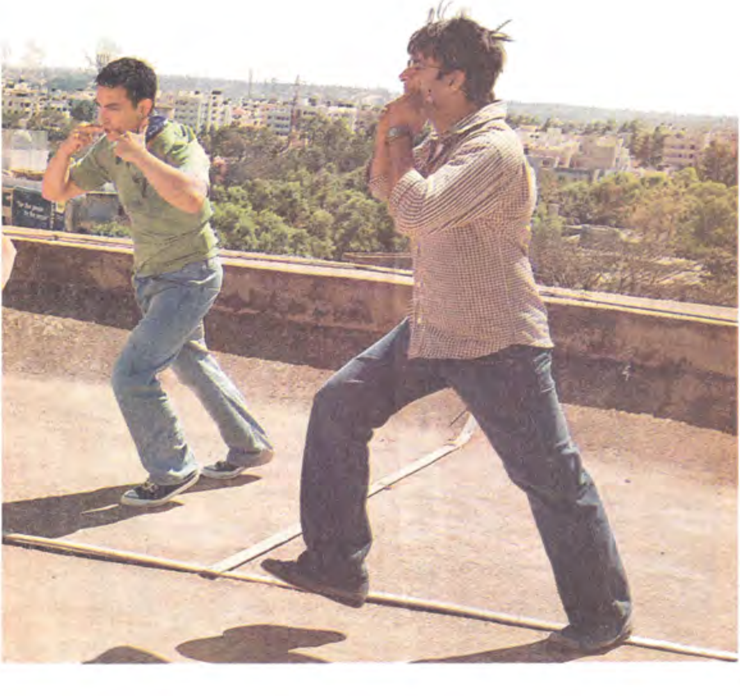
আমি কোনও ক্ষেত্রেই সত্যজিতের বিশেষ বদান্যতার কথা বলছি না। সিনেমার মূল Ethics-এর কথা বলছি। সিনেমা একটি মিশ্র এবং জটিল মাধ্যম। সেখানে এই জটিলতার বিবর্তনগুলি বহু উপাদানের সমষ্টি। তার মধ্যে সিনেমার গোড়ার দিকে নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট ভিত্তিসোপান ছিল সাহিত্য।

ফলে 'ক্ষীণ' বা 'প্রবল' যাই হোক—কাহিনিকার একজনই। অন্যান্যরা সেই কাহিনির নানা পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, নিজেদের শিল্পের দাবিতে। কিন্তু তাঁরা কাহিনিকার হয়ে উঠতে পারেন না।

পরিচালক রাজু হিরানিকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। তিনি যথেষ্ট সৃষ্টিশীল, সংবেদনশীল মনের মানুষ। এই অদ্ভুত ব্যবহার তাঁর কাছে আশা করিনি আমি।

তবে কি মুম্বই সিনেমা ক্রমশ সাহিত্যবর্জিত হতে হতে, নানা প্রযোজকের অফিসে-অফিসে ঘুরে বেড়ানো কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকারের নিয়ত সংস্পর্শের কারণে সাহিত্যকর্মকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে গিয়েছে?

না কি কেবল পিরিয়ড ফিল্ম যেহেতু এই নবীন চিত্রকাহিনিকারদের আয়ত্তাধীন নয়, সেহেতু এখনও 'দেবদাস', 'পরিণীতা'-য় তাঁরা শরৎবাবুর নাম দেখতে চান? প্রযোজক বিধুবিনোদ চোপড়া বাংলা সাহিত্যের সেই উজ্জ্বল নামটিকে শেষের চরিত্রলিপিতে ঠেলে যে দেন না, সেটা কি নামটার প্রতি শ্রদ্ধায়? না, এই নামটা থাকলে অন্তত Bengal Circuit-এ ছবিটি ব্যবসা করতে পারে এই আশায়?





পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

১৯২০ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একুশ। তিনি প্যারিসে। তিনি কপর্দকহীন। তিনি অখ্যাত। তিনি চেষ্টা করছেন লেখক হওয়ার। ক্রমাগত লিখতে-লিখতে, লেখার ভাষা আর বিষয় নিয়ে ভাবতে-ভাবতে, লেখা নিয়ে কথা বলতে-বলতে, নিজেকে লিখতে শেখাচ্ছেন তিনি। লিখছেন প্যারিসের কাফেতে বসে। লিখছেন পেনসিলে। লিখছেন ছোটগল্প। লিখছেন মদ খেতে-খেতে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। ঝোড়ো দিন। বৃষ্টির দিন। প্যারিস মৃত্যুর মতো হিম। হেমিংওয়ে ঢুকে পড়লেন তাঁর চেনা কাফের উষ্ণ অন্দরমহলে। ভিজে ওয়াটারপ্রুফ আর জীর্ণ টুপিটাকে র‍্যাকে টাঙিয়ে মদ অর্ডার দিয়ে টেবিলে বসেই লিখতে শুরু করলেন I hung up my old waterproof on the coat rack to dry and put my worn and weathered felt hat on the rack above the bench...and ordered a rum St. James. This tasted wonderful on the cold day and I kept on writing, feeling very well and feeling the good Martinique rum warm me all through my body and my spirit. হেমিংওয়ের টেবিলের পাশেই এক একলা তরুণী এসে বসল। She was very pretty with a face fresh as a newly minted coin. কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত বোধ করলেন তরুণ হেমিংওয়ে। মেয়েটিকে কোনওভাবে গল্পের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় না? I knew she was waiting for someone. So I went on writing. গল্পটা নিজেই নিজেকে লিখতে লাগল। এত দ্রুত, যে হেমিংওয়ের পক্ষে পাল্লা দেওয়া শক্ত হল। তিনি আরও একটা মদ অর্ডার দিলেন। I ordered another rum St. James and I watched the girl whenever I looked up. পেনসিল কাটছেন হেমিংওয়ে। পেনসিলের কাঠ পেনসিল-কাটা কল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে এসে মদের গ্লাসের নীচে প্লেটের ওপর জড়ো হচ্ছে, I sharpened the pencil with a pencil sharpener with the shavings curling into the saucer under my drink. তরুণীটির দিকে তাকিয়ে হেমিংওয়ে ভাবছেন, You belong to me and all Paris belongs to me and I belong to this notebook and this pencil.



এমন সোনাঝুরি গদ্যে একরত্তি বই 'আ মুভেব্‌ল ফিস্ট' লিখেছিলেন হেমিংওয়ে তিরিশের দশকে, তাঁর বিশের দশকের প্যারিস-স্মৃতি নিয়ে। আরও পনেরো বছর পরে এক বন্ধুকে লিখলেন হেমিংওয়ে, If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you for Paris is a moveable feast. যদি তোমার যৌবনের কিছুটা কাটিয়ে থাকো প্যারিসে, তবে যেখানেই কাটুক তোমার পরবর্তী জীবন, প্যারিস তোমার সঙ্গে থাকবে চিরকাল, কারণ প্যারিস হল ভ্রাম্যমাণ উৎসব। 'আ মুভেব্‌ল ফিস্ট'-এ এই প্যারিসকে শুধু নিজের করে রেখে দেননি হেমিংওয়ে। ভাগ করে নিয়েছেন সেই সময়ে প্যারিসে-থাকা জেমস জয়েস, এজরা পাউন্ড, স্কট ফিৎজেরাল্ড, গার্ট্রুড স্টিন-এর সঙ্গে। হেমিংওয়ের লেখায় একবার এই প্যারিসদীপনের স্বাদ পেলে, মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয় চিরকাল, বারবার ফিরে যেতে হয় সেই সম্মোহে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে আরও এক লেখকের কথা, যিনি লিখেছেন তাঁর কপর্দকহীন প্যারিস-অভিজ্ঞতার কথা 'ডাউন অ্যান্ড আউট ইন প্যারিস অ্যান্ড লন্ডন' বইয়ে। জর্জ অরওয়েল, যিনি লিখতে পারেন I had two glorious days of loafing, বর্ণনা দিতে পারেন সেই বর্ণময় বাউন্ডুলেমির, তিনিও আমাকে মুগ্ধ করেন ক্লান্তিহীনভাবে, বিশেষভাবে তাঁর অনন্য গদ্যের জন্য। তাঁর বইটির কথা অন্য একদিন লিখব।

বছর পঁয়ত্রিশের হেমিংওয়ে লিখেছিলেন 'আ মুভেব্‌ল ফিস্ট'। তখনও তাঁর অনুপম উপন্যাস 'দি ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সি' এবং নোবেল প্রাইজ-এ পৌঁছতে তাঁকে পেরতে হবে প্রায় আঠেরো বছরের পথ, মাঝপথে লিখতে হবে 'আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' এবং 'ফর হুম দ্য বেল টোল্‌স'-এর মতো উপন্যাস। কিন্তু 'আ মুভেব্‌ল ফিস্ট'-এর হেমিংওয়ে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে, তাঁর আপাত-বর্ণহীন, বাহুল্যবর্জিত, শানানো গদ্যে এসেছে তির্যক ঋজুতার স্বাতন্ত্র্য। কী সহজে

লেখেন তিনি, যেন মুখের ভাষার বাইরে এক শব্দও যাবেন না, অথচ এই তক্ষক সহজতায় নিয়ে আসছেন নির্বিঘ্ন নিজস্বতা, অননুকরণীয়! আ মুভেব্‌ল ফিস্ট-এর প্রথম বাক্যেই নির্ভুল হেমিংওয়ে Then there was the bad weather. আরও একবার কী দু-বার পড়ি আমরা বইয়ের এই প্রথম বাক্যটি। যেন আরও কিছু কথা বলা হয়ে গিয়েছে আগে, প্রেক্ষিতে আবছা কিছু অক্ষর। আমরা অনুভব করার চেষ্টা করি। এবং একইসঙ্গে পড়ে চলি, The leaves lay sodden in the rain and the wind drove the rain against the big green autobus at the terminal and the Cafe des Amateurs was crowded and the windows misted over from the heat and the smoke inside. এই কাফেতে পাঁড়মাতাল মেয়েপুরুষের ভিড়। এখানে যান না হেমিংওয়ে। কারণ মাতালদের গায়ের গন্ধ তাঁর ভাল লাগে না। তিনি যান Place St-Michel-এ অন্য এক কাফেতে, it was a pleasant cafe, warm and clean and friendly. অধিকাংশ সময়ে এখানেই বসে লেখেন।

নতুন কোনও গল্প শুরু করতে চলেছেন হেমিংওয়ে। কিন্তু প্রথম বাক্যটা কিছুতেই আসছে না পেনসিলের ডগায়। ঠান্ডা ঘরের মধ্যে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছেন হেমিংওয়ে। ছোট ছোট কমলালেবুর খোসা নিংড়ে রস ঝরাচ্ছেন ফায়ারপ্লেসের মধ্যে আর নিজেকে বলছেন, Do not worry. You have always written before and you will write now. All you have to do is write one true sentence. Write the truest sentence that you know. এইভাবে লেখক হওয়ার বীজমন্ত্রটি জানিয়ে দিলেন হেমিংওয়ে। কিন্তু ধরা যাক, হেমিংওয়ের কাছে কিছুতেই ধরা দিল না সৎ বাক্যটি। তিনি লিখতে শুরু করলেন অন্যভাবে, হয়তো কিছুটা বর্ণনাময় সেই লেখা। হঠাৎ সব কেটে বাদ দিয়ে দিলেন, I found I could cut that scrollwork or ornament out and throw it away and start with the first true simple declarative sentence. লেখার মাঝপথে খুঁজে পাওয়া সেই সৎ সহজ ঘোষণামূলক বাক্যটিই হয়ে উঠল তাঁর নতুন লেখার শুরু-বাক্য!

গার্ট্রুড স্টিন কিন্তু হেমিংওয়ের লেখা পছন্দ করছেন না, তরুণ হেমিংওয়েকে কী করে লিখতে হয় বলে দিচ্ছেন তিনি : তুমি যেভাবে লিখছ, সেভাবে লেখা উচিত নয়, তুমি লোকের মুখের কথা সাহিত্যে ব্যবহার করছ, এ-লেখা সাহিত্য হিসেবে দাম পাবে না। হেমিংওয়ের উত্তর, That are the only words that can make the story come true.

'আ মুভেব্‌ল ফিস্ট'-এ ছবি লিখেছেন হেমিংওয়ে। ছোট-ছোট বাক্য। তীরের মতো শব্দ। মিতবাক বিন্যাস। বিশের দশকের প্যারিসকে তার সমস্ত অনুষঙ্গ নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোহলাসক্ত প্রিয় বন্ধু ফিৎজেরাল্ড, উন্নাসিক মতিচ্ছন্ন কবি এজরা পাউন্ড, প্রায় অন্ধ লেখক জয়েস সবাই আছেন টুকরো-টুকরো ছবির মতো। সেই সঙ্গে আছে প্যারিস—তার ধীমান মাতলামি, তার সৃষ্টিশীল বাউন্ডুলেমি, তার উজ্জ্বল বিচিত্র বিকৃতি নিয়ে। There is never any ending to Paris, লিখছেন হেমিংওয়ে। 'আ মুভেব্‌ল ফিস্ট'-ও প্যারিসের মতো। কোনও শেষ নেই এ-বইয়ের। এ-বই একবার পড়লে বুকব্যাগে চিরকাল বয়ে বেড়াতে হয় বইটিকে। বাসে-ট্রামে-ট্রেনে-প্লেনে-অবসরে ফিরে-ফিরে আসতে হয় বইটির কাছে। কিছুতেই পুরনো হয় না এ-বই। কতবার পড়া বাক্য, তবু পড়ি, It was always Paris and you changed as it changed. বইয়ের শেষের বাক্যটি মনে গেঁথে থাকে, But this is how Paris was in the early days when we were very poor and very happy. হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যায় অক্ষরগুলি। মৃদু মন কেমন মিড় দেয় মনে।

আ মুভেব্‌ল ফিস্ট • আর্নেস্ট হেমিংওয়ে



গ্রানাদা থেকে মাদ্রিদ—২

মার্গারিতা

এদের কত অবসর। ইংলন্ডে অল্পবয়সিদের মধ্যে এমন অঢেল অবসরের দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। তরুমূলের বেদীতে দেখি ঠিক কলকাতার লেকের মতন রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের মিটিং চলছে। তাঁরা চা, কফি বিয়ারের দিকে নেই। পাঁচ-ছ'জন মিলে পাশাপাশি হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বেদীতে বসছেন, সান্ধ্য কাগজ পড়ছেন, গল্প করছেন। দেখতে ভাল লাগছে। টেবিলে বসে আমি এক কাপ কফি নিই। কাপুচিনো। আমার পাশে গ্লাস হাতে নিয়ে এক সুশ্রী মহিলা এসে বসলেন, বয়সে তিনি আমার মা-ও হতে পারতেন। হেসে বললেন—'তোমাকে অনেকক্ষণ দেখছি। তুমি তো ওদিকের ফোয়ারায় বসেছিলে। আলবের্তোর বেঞ্চিতে।'

'আপনি আমাকে দেখেছিলেন?'

—'দেখব না? ফ্রাঙ্কেস্কোর আহ্লাদি কুকুরটাকে নিয়ে ওরা যখন অসভ্যতা করছিল তখন তুমিই তো গিয়ে পথের কুকুরছানাটাকে আদর করছিলে। পথের কুকুরছানা বলে কি সে কেউ নয়? তোমাকে মেরিমাতা আশীর্বাদ করবেন। ওই দ্যাখো, ওইখানে আমাদের গির্জে। দেখেছ? অপূর্ব। এই শহরের পেট্রন সেন্ট মেরিমাতার ক্যাথিড্রাল এইটা।' আঙুল তুলে দেখালেন, যদ্দূর মনে হচ্ছে প্লাজার ভিতরেই, সুন্দর একটি গির্জে রয়েছে।

'আমি কফিটা খেয়ে নিয়ে দেখে আসব।'

—'নাঃ, পারবে না। এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খুব অন্যায়। কোনও পুজোর ঠাঁই কি আপিস? যে বন্ধ করবে? সদা সর্বদা মেরিমায়ের দরজা খোলা থাকা উচিত। কে কখন আসতে চাইবে। এসব যে এদের কী নিয়ম! খুব বিশ্রী! তুমি কাল যেও বরং।'

—'কাল আমি থাকব না। আজই মাদ্রিদ ফিরে যাচ্ছি রাত্রের ট্রেনে।'

—'আহা। আলবের্তোর তোমাকে আগেই পাঠানো উচিত ছিল গির্জে দেখতে।'

—'উনি তো আমাকে চেনেন না।'

—'তুমি ওর গেস্ট নও?'

—'নাঃ। এইমাত্র তো আলাপ হল। কিন্তু আপনি এ শহরে সবাইকেই চেনেন দেখছি।'

—'তা চিনি। বহুদিনের বাসিন্দা আমরা। আলবের্তোও বহুকালের। ফ্রাঙ্কেস্কো বরং অল্পবয়সি ছেলে, ওর কত আর, ষাট বাষট্টি হবে। ছোট পাড়া, সবাই সবার চেনা। নাতি নাতনিদের নিয়ে সব প্লাজাতে বেড়াতে এসেছে।'

—'আলবের্তো কী করেন?'

—'ওই তো। চিরকালের বই-পাগলা, বইয়ের দোকান আছে ওর। বিয়ে থা করেনি। একটা পা একটু ডিফেকটিভ তো? পড়াশুনো আছে প্রচুর। খুব ভালমানুষ, আর তেমনি লাজুক আলবের্তো। তোমার সঙ্গে অত কথা বলছে দেখে ভাবলুম তুমি ওরই গেস্ট হয়তো। ও তো বিপ্লবী, অনেক ধরনের লোককে চেনে। ফ্রাঙ্কোবিরোধী ছিল কিনা? ওই সময়টায় দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে চলে গিয়েছিল ও। মুক্তির পরে স্পেনে ফিরেছে।'

ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আলবের্তো নামের গোটা মানুষটার রূপরেখা আস্তে আস্তে আকার নিতে লাগল আমার মনের মধ্যে। সামনে যাকে দেখছি তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি। অসুবিধে হয় না। কফি শেষে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, আরে, মহিলা তো চমৎকার ইংরিজি বলছেন! কী ইশটুপিট আমি, এতক্ষণ এই জরুরি ব্যাপারটা মোটে খেয়ালই

করিনি? আমার ঔপনিবেশিক অভ্যেসে ইংরিজি বলাটা সহজ ভাবে মেনে নিয়েছি!

এবারে তবে পরিচয় বিনিময় হয়ে যাক।

'আমি নবনীতা, কলকাতায় থাকি। আপনার নাম?'

—'মার্গারিতা।' দুষ্টু হেসে তিনি বলেন, 'দ্যাট্‌স হোয়াট আই অ্যাম ড্রিংকিং টু!' সহাস্যে মহিলা তাঁর হাতের চ্যাপ্টা তেকোনা স্ফটিকের গ্লাসটি তুলে দেখান। মার্গারিটা টলটল করে ওঠে। আমরা ওটিকে মেক্সিকান পানীয় বলে জানি, কিন্তু তার মূল হয়তো এইখানেই। মেক্সিকোর শিল্প সংস্কৃতির নিজস্ব মুখ স্পেনের ঔপনিবেশিক চাপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনকার মুখচ্ছবি প্রধানত স্পেনের থেকে পাওয়া।

—'এত ভাল ইংরিজি বলেন আপনি—'

—'আমি স্কুলে ইংরিজি পড়াতুম যে! এখন অবসর নিয়েছি। তুমি?'

—'আমিও আমার দেশে, ভারতবর্ষে, সাহিত্য পড়াই। ইংলন্ডে এসেছিলুম কাজে। স্পেনে কখনও আসা হয়নি আগে, তাই এদিকে একটু ঘুরতে বেরিয়েছি, আজই রাত্রে ফিরে যাচ্ছি মাদ্রিদ। কাল লন্ডন। পরশু সাসেক্স। আর তার পরদিন কলকাতা। আমার বাড়ি কলকাতায়। অনেক দূর,—ওই যে, কালকুত্তা?'

'কালকুত্তা?' মার্গারিতার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 'চিনি তো, চিনব না? মাদার তেরেসার শহর!'

বিদেশিনী কত অনায়াসে, মুহূর্তেই চিনে গেলেন আমার শহর। এবং আমাকে টেনে নিলেন তাঁর মনের কাছাকাছি। যেন একটা চাবি দিয়ে একটি নতুন দরজা খুলে গেল। অবিকল এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ইতালিতে, লেক কোমোর তীরের একরত্তি এক গ্রামে, আমি বেলাজিয়োর ভিলা সেরবেলোনি থেকে নৌকো করে গিয়েছিলুম ওখানে একটা বিখ্যাত বাগানের ফুলের শোভা দেখতে। কোমো হ্রদের তীরের একটি ছোট্ট দোকানের দোকানি আমার সঙ্গে আলাপ করে জানতে চেয়েছিলেন আমি কোথা থেকে এসেছি। 'কালকুত্তা' শুনে তাঁর সে কী আহ্লাদ! তক্ষুণি আমাকে মাদার তেরেসার ছবি দেখালেন একটি বই বের করে। আমাকে একটি উপহারও দিলেন, এই সহসা সাক্ষাতের স্মারক। সাক্ষাৎ তো নয়, স্বজন-মিলনের আনন্দ ছিল তাঁর চোখেমুখে। মার্গারিতাও তেমনি উজ্জ্বল হাসিমুখে, অন্য এক সুরে, চেনা লোকের মতো গলাতে বলে উঠলেন,

—'জানি জানি। কালকুত্তা তো 'City of Joy'? আমি ছবি দেখেছি, আমি জানি, ওটা তো আমাদেরই মাদার তেরেসার শহর।' তার পরে মার্গারিতার কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'কিন্তু শহরটা কি এখনও আছে? আমি তো ভেবেছি প্রবল বৃষ্টিতে-বন্যায় কালকুত্তা বুঝি ডুবেই গিয়েছে। তুমি কি এখনও ওইখানেই থাকো?'

—'নাঃ। এখনও ডোবেনি শহরটা, ভেসে আছে। আমি ওইখানেই থাকি।'—কী আর বলব? সিটি অফ জয়ের ওই বৃষ্টিতে কি শহর ডোবানো বান ডাকে? কলকাতা শহরে অমন বৃষ্টির বন্যা তো বছর বছর হচ্ছে। ওতেই মুছে গেলে আমাদের চলবে? শহর কলকাতার অতি কড়া প্রাণ। হ্যাঁ কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি বটে শেষের সেদিন ভয়ংকরের কথা। ২০১০ নাগাদ উষ্ণায়নের বানের জলে ডুবে যাবে কলকাতা। মর্তের বৈজ্ঞানিক অনাচারে আকাশের ওজোন স্তরের পর্দা ঘুচে যাচ্ছে, সোজাসুজি ঠিকরে আসা গনগনে রোদে দক্ষিণ মেরু বিগলিত হয়ে একদিন বঙ্গোপসাগরে বান ডাকাবে, আর সেদিন কলকাতা সুদ্ধু গোটা চব্বিশ পরগনার গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে। বালাই ষাট! অমন দিনে সিন্ধুতীরের স্পেনই কি আর অক্ষত থাকবে? আমি কথা ঘোরাই।

—'একটু হেঁটে আসি? চলুন না, যাবেন? ওই প্রমেনাদ-টা দিয়ে? বড় সুন্দর। বেড়াতে খুব লোভ হচ্ছে।' পায়ের ব্যথা ভুলে গিয়ে বলি। 'সত্যি বড় সুন্দর আপনার শহরের প্লাজা। একটু দেখে আসি। আর তো আসা হবে না।'

ইতিমধ্যে আলবের্তো এসে পড়েছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করেন,—'ট্রেন ক'টায়? ১১ নং, ৩ নং, আর ৯ নং বাস স্টেশনে যাবে। যেতে এখান থেকে ১৫ মিনিট লাগে। প্রমেনাদে বেড়াতে গেলে, বাসের সময়টা মনে রেখো।' শ্রীমতী মার্গারিতার গেলাসের মার্গারিটা শেষ হয়নি, তিনি আর পা চালাতে উঠলেন না। আলবের্তোও বসে পড়লেন তাঁর পাশে। প্রমেনাদে অত পুলক নেই দু'জনের কারুরই। এ তো ওঁদের প্রত্যহের চলার পথ।

—'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।' বলতে বলতে অগত্যা প্রমেনাদ দিয়ে একা একাই হাঁটতে শুরু করি। এ রাস্তা তো যে সে রাস্তার মতো নয়, এ হল একেবারে বড়লোকের বাড়ির মার্বেলের দালান, দাবার ছকের মতো কালো সাদা চেক কাটা মেঝের। দু'ধারে বড় বড় ছায়াময় গাছতলায় সুদৃশ্য বেঞ্চি পাতা। তাতে সঘন প্রেমিক প্রেমিকা, একক বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, দুঃখী যুবক, ড্রাগ অ্যাডিক্ট, ঘুমন্ত হোমলেস, সবরকমই মজুত আছে। পথটির দু'পাশে সারিবন্দি সুন্দর বাতিস্তম্ভ, আর তার নীচে স্বাস্থ্যবান, হাসিখুশি নর্থ আফ্রিকান ছেলেরা ফেরি সাজিয়ে বসেছে। তাদের ডালাতেও কিন্তু মাদ্রিদের মতো, অধিকাংশই ভারতীয় হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট,- আফ্রিকান পণ্যদ্রব্য নয়। এই জায়গাটাতে বেড়াতে খুব ভাল লাগছে। বিশ্রাম নিতে মাঝে মাঝে বেঞ্চিতে বসছি, কেননা পা আপত্তি করছে।—বেচারি পায়ের দোষ নেই, অত্যেচারটা কি কম হয়েছে? একে তো সারাদিন ধরে হেঁটে হেঁটে অসাধারণ ইসলামি স্থাপত্যের কারুকার্য সমৃদ্ধ সেই 'আলহামব্রা' প্রাসাদ ঘুরে দেখেছি, সব পরিশ্রম সার্থক। তারপরে নগরের প্রান্তে লোরকার গ্রীষ্মাবাস দেখে এসেছি। এটি খুঁজে বের করতে খুব জেদ আর খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। দক্ষিণ স্পেনের চড়া রোদ্দুরে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে প্রচুর। আলহামব্রা এখানকার প্রসিদ্ধতম



ঐতিহাসিক ট্যুরিস্ট স্পট, সেটা দর্শনের সরকারি বেসরকারি বহু ব্যবস্থা রয়েছে। আমার একটুও অসুবিধে হয়নি সেখানে পৌঁছে যেতে। কিন্তু হায়, লোরকার গ্রীষ্মাবাসের খবরই যে শহরের লোকজনে বিশেষ রাখে না দেখছি। হাঁটতে হাঁটতে জিগ্যেস করতে করতে হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, একে তো আমার ভাষার বাধা, তায় পথচারীদের অজ্ঞানতার আড়াল। এমন সময়ে রাস্তার মোড়ে পিঠে ব্যাকপ্যাক বাঁধা একজন মার্কিনি ছাত্রের উদয় হল। আমি অমনি শ্রীরাধার মতো আকুল হয়ে তার দিকে ছুটে যাই। ও তো ছাত্র ট্যুরিস্ট, ও নিশ্চয় খবর রাখবে। কমসে কম ইংরেজি তো জানবে। দৈববাণীর মতো, সেই ছেলে আমাকে খোঁজ দিল বাড়িটার। 'যাচ্ছ যাও, দেখে এসো, তবে অসাধারণ কিছু নয়।' কথাটা সত্যি। তাছাড়া অত খুঁজে পেতে যে-বাড়িটি দেখতে পেলুম সেটি তখন বন্ধ। ভিতরে প্রবেশ করা গেল না। বাড়ির দেখভাল যিনি করেন, তাঁকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু শুধু বাইরে থেকে দেখতে পেয়েও আনন্দ হল আমার, হাজার হোক লোরকার বাড়ি তো? এত খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেলে আফসোস থেকে যেত।

প্রমেনাদে বেঞ্চিতে বসে এইসব এটা সেটা ভাবছি, হঠাৎ দেখি লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে আলবের্তো সেখানে এসে হাজির। বললেন—'এবারে ওঠো। সাড়ে দশটা বাজে। তোমার ট্রেন এগারোটায়। চলো তোমাকে বাসে তুলে দিই।'

সবই বললেন অবশ্য স্প্যানিশে, আমিও দিব্বি আন্দাজে বুঝে গেলুম আদ্যোপান্ত। এই যত্নটি কিন্তু বিশেষ, কেননা এত সমাদর শাড়ির গুণে নয়, আমার পরনে এ যাত্রায় শাড়ি নেই, জিন্‌স আর কুর্তা। শুধু গায়ের রঙে দিশি জেল্লাটা আছে, আর বাদামি কপালের মাঝখানে ললাটলিপির মতো শোভা পাচ্ছে মেরুন ফোঁটা। মালপত্তর বলতে একখানা চামড়ার পুঁটলি-ঝোলা ঝুলছে কাঁধে, এই নিয়েই ঘুরছি স্পেনে সারাদিন সারারাত। চলো মুসাফির বাঁধো গাঠেরিয়া! ইউরোপের রাস্তায় আমার মতন এরকম মূর্তি গণ্ডায় গণ্ডায়, খুবই সাধারণ দৃশ্য। কেবল বাদামি রং, কালো খোঁপা, আর কপালের ওই এক ফোঁটা মেরুনটুকুই যা আলাদা। তাতেই আমি এদের চোখে যথেষ্ট দূরের, যথেষ্ট অচেনা যথেষ্ট রহস্যময়। বিদেশিনী অতিথির প্রতি দেশের বিবেকী গৃহস্থের দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, সব জেগে উঠেছে আলবের্তোর স্বদেশি চেতনায়। মার্গারিতাকে বিদায় জানিয়ে, সপরিবার ফ্রান্সেস্কো আর তার সারমেয়কে হাত নেড়ে, আমি প্লাজা ছেড়ে চলি আলবের্তোর সঙ্গে, বাস স্টপের দিকে।

আমাকে যত্ন করে সঠিক বাসে তুলে দিয়ে, নিজেই বাস ড্রাইভারকে ডেকে আমার টিকিটটা কেটে দিলেন আলবের্তো, আর শুধু তাকেই নয়, যাত্রীদেরকেও বারবার বলে দিলেন আমাকে যেন স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয়। আলবের্তোকে অভয় দিয়ে, আমায় নিয়ে বাস চলল গ্রানাদা ইস্টিশানে। এখানকার পালা শেষ। জানি না আবার কবে আসব, কোনও দিন আসা হবে কি না। অনেক কিছু বাকি রইল। কখনওই তো কিছু সম্পূর্ণ হয় না আমার জীবনে। অসম্পূর্ণতার মালা গেঁথে চলা। তবু যা পাই তার জন্যই আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। এতটা কি আমার প্রাপ্য ছিল? ফোয়ারায় উজ্জ্বল, আলোয় ঝলমল, মানুষে ভরা, উৎসবমুখর প্লাজাতে লাঠি হাতে একলা একটি নিঃসঙ্গ সিলুয়েৎ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আমাকে বিদায় জানিয়ে তখনও সাদরে হাত নাড়ছিলেন আলবের্তো, আমিও হাত নাড়ছি বাস থেকে, বাসটা মোড় ঘুরল।

০৭.০১.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com


simoco
MOBILES
...cos there is
MAGIC
in every
TOUCH
Magic Touch
SM1100X
2.8 Inch. TFT Screen with Magic Touch
Dual SIM / Dual Standby
FM Radio with Recorder
Audio / Video Recording
WAP / GPRS / MMS / SMS
MP3 / MP4 Player / Bluetooth
3D Sound with Double Speakers
USB Connectivity / Noise Reduction
Black List / Mobile Tracker
2000 mAh Battery / Indian Calender / Hindi Language
Rs. 4299
Desh ki dhadkan ko sun
www.simoco.net

এবার মলাট ▲ বাণী বসু

আমার অপু তোমার অপু

ভালবেসে ফেলা বই থেকে যখন সিনেমা তৈরি হয়, দেখে শক লাগে গোড়ায়। নিজের লেখা বই থেকে তৈরি ছবি দেখতে গেলে, শক প্রায়ই বজায় থাকে শেষেও।

ছবি যে বইয়ের মতো হয় না তা কিন্তু আমার জানা ছিল।

যে সত্যজিৎ রায় আমাদের কল্পনার অপুকে সিগনেট প্রেসের ছাপা 'আম আঁটির ভেঁপু'-র ওপর তুলির রেখা টেনে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সত্যজিতই 'পথের পাঁচালী'-র ক্যামেরায় ভেঙে ফেললেন অপুকল্প, দুর্গাকল্প। আমাদের বুকের মধ্যে যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। বিভূতিভূষণ যে অলৌকিক মাত্রা দিয়েছিলেন অপু-দুর্গাকে, সত্যজিৎ সেটা ছেঁটে আমাদেরই মতো দু'টি ছেলেমেয়েকে হাজির করলেন পর্দায়। খুব কষ্ট হয়েছিল। আমরা তো গভর্ন্যান্স অব দ্য প্রোলেতারিয়েত-এ বিশ্বাসী ছিলাম না। আজন্ম আমরা হিরো ওয়রশিপার। বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহর, এমনকী প্রসন্ন গুরুমশায়ও আমাদের প্রসন্ন করতে পারেননি। যখন পড়েছি, আমরা নিশ্চিন্দিপুরের দারিদ্র্যের কুশ্রীতা তো দেখতে পাইনি, নরোত্তম দাসের চাঁপা ফুলের গন্ধ আমাদের ঘুমের মধ্যে ভুরভুর করত, যুগী বামুনের মেয়ে বিনির সঙ্গে চড়ুইভাতির অন্নে আমরা দুর্গার মতোই বিভোর হয়েছিলাম। কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি আমাদের সারা ছোটবেলার দেখা সমস্ত কালবৈশাখীর সঙ্গে মিলে-মিশে এমন ব্যক্তিগত হয়ে গিয়েছিল যে, সিনেমার কালবৈশাখী শত চেষ্টা করেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। নিশ্চিন্দিপুরের রূঢ় বাস্তব দেখা হল, কাশজ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার একটি দৃশ্য বাদে নিশ্চিন্দিপুরের কবিতা অধরা রয়ে গেল। এ কি আমাদের ছেলেমানুষি, না সত্যজিতের রিয়ালিজমের বাড়াবাড়ি? জানি না। পরে উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছবিটি দেখতে দেখতে মেনে নিয়েছি তার শ্রেষ্ঠতা, বুঝেছি চলচ্চিত্রকারের পাঠও। কিন্তু বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে, হৃদয়ের ভাল্‌ভ-এ কোথাও ফুটোটা রয়েই গিয়েছে।

ক্লাসিক নিয়ে কাজ করার এই বিপদ। বহু পাঠকের স্বপ্ন ভাঙতে ভাঙতে যেতে হয়। নিজের পাঠ অন্যদের পাঠের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সময়ে অন্য স্বপ্ন সৃষ্টি করতেই হয়।

আমার কাছে যখন ফিল্মের জন্য বই কিনতে আসা-যাওয়া শুরু হল তখন এই পুরাতন নৈরাশ্যের কথা আমার স্মরণে ছিল না। তবে এটুকু জানতাম—পুরোপুরি মিলবে না। আর সত্যি কথা বলতে কী, পরিচালক যদি নিজে কিছু সৃষ্টি করতে না পারেন শুধু শুধু উপন্যাসের লাইনগুলোকে দাগিয়ে যাওয়ার কীই বা মানে? অর্থাৎ আরেকটা ভুল করে ফেললাম, ধরে নিলাম সব পরিচালকই এক-আধ পারসেন্ট অন্তত সত্যজিৎ, তাঁরা সৃষ্টি করতেই চান।

পরিচালক স্রষ্টা হোন বা না হোন তাঁকে পাবলিককে খাওয়ানোর খাতিরে কিছু-কিছু ফর্মুলা ঢোকাতে হয়, এটা থিওরিতে মানা এক, আর চোখের সামনে দেখা অপালা ভরতনাট্যম নাচছে, তার সঙ্গে তথাকথিত সোহম একেক জায়গায় একেকরকম পাঞ্জাবি পরে এসে দাঁড়াচ্ছে, এ আবার আরেক। শক রীতিমতো। চোখ ক্রমশ বড় বড় হয়ে যেতে যেতে ছিটকে মুখের ফ্রেম ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। একটি রাগি তরুণ, প্রেমে পড়েছে, তার প্রেমিকা তাকে নানাভাবে খেলিয়ে শেষে যারপরনাই অপমান করেছে, তার আক্রোশ, হতাশা তাকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করেছে, জিনিসটার গুরুত্ব এক, আর একটি ছোট ছেলে, তার হাবভাব সবেতেই বিরক্তিকর অসভ্যতা, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দু'টো নিশ্চয়ই ওজনে এক নয়। অথচ গান্ধর্বী-র তরুণ রগো ফিল্মের এক শটে হয়ে গেল ওই ছোট্ট অসভ্য ছেলেটি, যে নাকি অপালার মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের কারণ। অবজেকটিভ কোরিলেটিভের এহেন হেনস্তার ছবি কে দেখবে? অথচ কত ভাল ভাল গান ছিল। হৈমন্তী শুক্লা, জয়িতা পান্ডে, অরুণ ভাদুড়ি, শ্রীকান্ত আচার্য। গানগুলোও তো কই শুনি না।

এই 'গান্ধর্বী' আবার সিরিয়ালও হয়েছিল। যিনি করেছিলেন তিনি বলেন, তিনি গান্ধর্বী নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। তাতে গান্ধর্বী-র বেচারা লেখক মুগ্ধ। নিন, যা খুশি করুন, স্বপ্ন দেখছেন যখন। তাঁর সেই স্বপ্ন আমি যতদূর দেখেছি সে এক প্রবল দাম্পত্য ঈর্ষার গল্প। অর্থাৎ উপন্যাসে যে মোটিফ একেবারেই গৌণ ছিল, তাকেই মুখ্য জায়গা দিল পরিচালকের পাঠ। ওইটুকুই কি তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় চেনা পেয়েছিলেন? অথচ সুর নিয়ে কী প্রবল ভাল ছবি হিন্দিতে হয়েছে, গিরিশ কারনাড আর জয়া প্রদার 'সুরসঙ্গম'? 'শংকরভরণম' নামে দক্ষিণে হয়েছিল আগেই। নৃত্য এবং সংগীত নিয়ে অপেরা-ব্যালের ঢঙে হয়ে গিয়েছে 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে'। আমাদের এখানেও 'বসন্তবাহার' নামে একটি সংগীত-ভিত্তিক ছবি হয়েছিল, সেন্টিমেন্টাল হলেও খুব খারাপ হয়নি।

উপন্যাসের মহত্ত্ব সত্ত্বেও কত ছবি চমৎকার উতরে গিয়েছে। 'ওয়র অ্যান্ড পিস'-এর মতো এপিক উপন্যাস সিনেমায় সম্ভব হল, 'ওথেলো'-র কতরকম ব্যাখ্যা, তা-ও দেখেছি খুশি হয়ে। 'ব্রাদার্স কারমাজোভ' কীভাবে কেউ করতে অগ্রসর হলেন সেটাই এক বিস্ময়! কোনও এক 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস'-এর ট্রিটমেন্ট কমিক—এইটুকু বুঝলে ভালই লাগে। আবার একই উপন্যাস কিরা নাইট্‌লি-র অভিনয়ে আরও ভাল লাগে। বেশি কথা কী? 'দেবদাস' কতবার কতরকম করে হয়ে গেল। দিলীপকুমার সুচিত্রা সেনের 'দেবদাস' নমস্য। কিন্তু সঞ্জয় লীলা বনশালির 'দেবদাস'ও আমার খারাপ লাগেনি। সময়টাকে এগিয়ে আনা হয়েছে। ঠিক আছে। জাঁকজমক বেশি, সময় ও সাধ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। চরিত্রগুলোর বাঙালিয়ানা ঘুচে বেশ একটু হিন্দিফিকেশন হয়েছে, কিন্তু মূল পাঠে কোথাও বিকৃতি নেই। দেব-ডি নামে একটি ছবি হয়েছে, আমার দেখা হয়নি, কিন্তু অন্যদের প্রতিক্রিয়া শুনে বুঝতে পারি কিছু একটা সৃষ্টি হয়েছে। 'নষ্টনীড়' সত্যজিতের ক্যামেরায় হল 'চারুলতা'। তাঁর হাতের খেলায় ভূপতির চেহারা চরিত্র পাল্টে ট্রাজিক হয়ে গেল, অনেক গভীরতা তার, অমলের রূপান্তরে সেখানে বুকে ধস নামে, চারু উঠে এল বই থেকে আরও জীবন্ত হয়ে। মনে হল সিনেমার চারু, রবীন্দ্রনাথের চারু-র চেয়েও চারু। সে চারুলতা। 'ঘরে-বাইরে'-তেই কি তিনি কম সৃষ্টি করেছেন? বিমলার মোহ, সন্দীপের চতুর মেগ্যালোম্যানিয়া, সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে নিখিলেশ। শেষ দৃশ্যটি তিনি কী গভীর চিন্তার সঙ্গে আঁকলেন। সমস্তটাই সৃষ্টি, নতুন কিছু, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, কিন্তু নিজের মতো করে পাঠ করে।

কেউ যখন আমাদের লেখা নিয়ে ছবি করতে চান, এইসব উদাহরণ আমাদের সামনে জেগে থাকে, তাই স্বাধীনতা দিতে দ্বিধা করি না। কিন্তু কিছু শর্ত আরোপ করি, এটা এরকম করবেন না, ওটা ওরকম করবেন না, আমাদের দেখিয়ে নেবেন, একটা



লক্ষ করুন, শাশুড়ি নন, ভাসুরের হাত দিয়েও 'শ্বেতপাথরের থালা' পৌঁছয় বিংশ শতকের এমন মেয়েদের হাতে। ছবিটি দেখার পর ওই ভাসুর ভদ্রলোক কান্নাকাটি করে বলেন তিনি কী অন্যায় করেছেন বুঝতে পেরেছেন, আর এভাবে বৈধব্যপালনের দায় থেকে ভ্রাতৃবধূকে মুক্তি দেন তিনি। আরও নানা গল্প শুনি, কীভাবে গ্রামাঞ্চলে অনেক ভুক্তভোগী বলেছেন—এভাবে তো কোনওদিন ভাবিনি, কীভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে আমাদের! গল্পটিকে যেভাবেই পেশ করে থাকুন পরিচালক, মূল উপন্যাসটির মেসেজ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছেছে। তখন থেকেই পরিচালকদের ওপর আমার একটা উদার ক্ষমাশীল

ওয়ার্কশপ করলে ভাল। কিন্তু সামান্য মানুষ আমরা, কে আমাদের কথা শুনছে? বরং আমাদের মতো ফিল্ম-অশিক্ষিত বোকাদের নিতান্ত ছেলেমানুষ হিসেবে নেওয়াই ভাল, এটাই ভাবেন পরিচালকরা।

অপর্ণার অনুরোধে যখন 'শ্বেতপাথরের থালা' ফিল্ম করার অনুমতি দিই, এ-সব আমার মনে হয়নি। এমন কিছু কঠিন বই নয়, করে ফেললেই হয়ে যায়। খালি একটাই মুশকিল, অনেকটা সময়কে ধরতে হবে। নায়িকা বন্দনার ছেলে সেখানে ছোট্ট থেকে বড় হয়ে যাবে। তাই খালি এইটুকু নিয়েই আমার ধন্দ ছিল। ছবিটির প্রথমাংশ আমার ভালই লেগেছিল। কিন্তু শেষটা কী করে মানব বলুন? একটা রঙিন পাড়ওয়ালা শাড়িতেই যদি সংস্কারমুক্তি হয় তা হলে তো পুরো সমস্যাটাকেই খুব খেলো করে দেখানো হয়ে যায়! তা ছাড়াও বন্দনার শেষ সংগ্রাম তো সন্তানের সঙ্গে, যে নাকি বৈধব্য, সংস্কার আর বাবার স্মৃতিকে ঢাল করে মায়ের বিয়েটা আটকাতে চাইছে, সে মাকে ঈর্ষা করে তাঁর কৃতিত্ব ও নিজের অকৃতিত্বের জন্য। এটাই তো একজন সিঙ্গল মাদারের জীবনে একটা কেন্দ্রীয় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা, যেটা নিয়ে ঋতুপর্ণ ভেবেছেন 'উনিশে এপ্রিল'-এ, সে-ছবিটা একটা সিরিয়াস প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই একটা গোটা চলচ্চিত্রের বিষয়। হয়তো ওই পরিসরে ধরানো যেত না। কিন্তু রূপ নামে বন্দনার ওই ছেলে ফট করে ফার্স্টক্লাস পেয়ে গেল, যেন ফার্স্টক্লাস ছেলের হাতের মোয়া, তারপরে তার একটি অর্বাচীন মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল, মেয়েটি আর তার বাড়ির স্থূলত্ব যে বড্ডই ছেলেমানুষি ফর্মুলা হয়ে গেল। ঠিক জায়গা মতো কিছুই হল না। আমার এখনও মনে হয়, উপন্যাসে যেরকম শেষ আছে সেরকম করলে ছবিটা একটা জায়গায় পৌঁছত। পরিচালক লেখক ও দর্শকের ওপর আর একটু বিশ্বাস রাখলে পারতেন। কিন্তু কী বলব, ছবিটির সাফল্য আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল।

একটি অফিসের আমন্ত্রণে গিয়েছি। সেখানকার কর্মী একটি মেয়ের জীবনে ফিল্মটির ভূমিকা শুনুন। মেয়েটি শিক্ষিত, উপার্জন করে, তা সত্ত্বেও, অর্থাৎ এই পটভূমির মেয়েকেও তার স্বামী মারা যাওয়ায় কঠোর বৈধব্য পালন করতে হত, তার ভাসুরের নির্দেশে। কলকাতার শহর, মেয়ে চাকরি করে, অল্পবয়সি, এবং

সস্নেহ দৃষ্টিভঙ্গি এসে যায়।

সেটা দৃঢ়তর হয় যখন সৌমিক 'একুশে পা' সিরিয়াল করতে গিয়ে অবিকল ভেঙ্কটেশ, উজ্জয়িনী, ঋতুপর্ণাকে তুলে আনেন। ইচ্ছে থাকলে তা হলে পারা যায়! একমাত্র ইমনের ভূমিকায় আমি একটি ভাল টেব্‌ল টেনিস খেলা মেয়েকে চেয়েছিলাম, ওরা দিতে পারেনি। 'কোনি'-র জন্য যদি সত্যি সাঁতারু পাওয়া যায়, 'একুশে পা'-র জন্যেই বা একখানা টেব্‌ল টেনিস মেয়ে পাওয়া যাবে না কেন? গল্পটির কেন্দ্রই এই ইমনকে নিয়ে, যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্যে স্থির, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সে পথ কেটে বেরিয়ে যায়, মুখে শান্ত হাসি, কেউ বুঝবে না কী স্ট্রাগলটা সে করছে। শেষের দিকটা ভাল করতে পারেনি সৌমিক, কিন্তু যেটুকু করেছে তাতেই জমিয়ে দিয়েছে। ক্যাম্পাস স্টোরি বলে সে সময়ে হিন্দিতে যা চলছিল তার থেকে অনেক অনেক ভাল।

এই উপন্যাসটি আবার সাগরদা (সাগরময় ঘোষ, সম্পাদক, 'দেশ')-র বিশেষ প্রিয় ছিল, ওঁর এক সম্পর্কে নাতনি নয়নতারা অভিনয় করছিল উজ্জয়িনীর ভূমিকায়, উনি খুব উৎসাহ নিয়ে দেখতেন, এবং আমাকে ফিডব্যাক দিতেন।

সাম্প্রতিকতম 'বালিগঞ্জ কোর্ট'-এ ভুল-ভ্রান্তি অনেক কম। চিত্রনাট্য চমৎকার। অভিনয় করেছেন পরিণত শিল্পীরা। শেষটা কেউই দেখি গতানুগতিকের হাত ছাড়াতে পারেন না। কিন্তু সে কথা থাক। এঁরা নাম বদলেছেন, গল্পটির নাম ছিল 'দীপশিখা'। বদলে এঁরা একেবারে ঠিক করেছেন, কিছু কিছু দৃশ্য ঢুকিয়েছেন, কোথাও বেমানান হয়নি, দেখে আমার মনে পড়ে যায় আরও কিছু টেলিফিল্মের কথা। প্রত্যেকটি সুন্দর। 'নন্দিতা' করেছিলেন উর্মি চক্রবর্তী ন্যাশন্যালের জন্য হিন্দিতে। প্রভাত রায় করেছিলেন 'যখন চাঁদ' ও 'ভাবমূর্তি'। বিশেষত দ্বিতীয়টি খুবই ভাল হয়েছিল। পরিচালকের মধ্য থেকে শিল্পী মানুষটি যখন বেরিয়ে আসেন, নির্দ্বিধায় হাত ধরেন লেখকের, ভাবেন, অনুভব করেন, টেকনিকের সঙ্গে ভাব মেশান, অতিরিক্ত এবং রূপান্তর তখনই গ্রাহ্য হয়, তখনই সাহিত্য থেকে ভাল ছবি তৈরি হয়, যেমন হয়েছে 'খণ্ডহর', 'পার', যেমন হয়েছিল 'অতিথি', 'জতুগৃহ', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অপরাজিত', 'পরশপাথর', 'নির্জন সৈকতে', 'যদুবংশ', 'ছায়াসূর্য' ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবলম্বনে ▲ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রহণ করেছ যত

শেক্সপিয়রের নাটকের প্রায় সমস্ত গল্পই অন্যের। যতই তিনি গ্রহণ করেছেন প্লুটার্ক, হলিনশেড, আর্থার ব্রুক থেকে, ততই ঋণী করেছেন তাঁদের। কারণ সে সব সামান্য গল্প অবলম্বনে রচনা করেছেন অবিশ্বাস্য, তুঙ্গস্পর্শী সাহিত্য।

শেক্সপিয়র-এর—স্বয়ং উইলিয়াম শেক্সপিয়র-এর—কোনও গল্পই কি তাঁর নিজের? সবই তো প্রায় উধার কা মাল ইধার! এতটাই প্রকটভাবে যে, তাঁর সতীর্থ রবার্ট গ্রিন না বলে পারেননি শেক্সপিয়র আমাদের সকলের লেখা থেকে বেমালুম ঝেড়ে দিচ্ছে, আসলে সে ভুঁইফোড় দাঁড়কাক, আমাদের পালকে সে সেজে-গুজে বসেছে, Shakespeare is an 'upstart crow, beautified with our feathers' (রবার্ট গ্রিন-এর Groatsworth of wit থেকে)। সমকালীন লেখকের তীব্র পরিভাষণে কান না-দিয়ে শেক্সপিয়র ক্রমাগত ধার করে গিয়েছেন, অন্যের গল্প নিজের বলে চালিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি কখনও। করেননি তার কারণ, কয়লার বুক থেকে তিনিই উদ্ধার করেছেন হিরে, ঝিলিয়ে তুলেছেন তাকে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার দ্যুতিতে। শেক্সপিয়র, যিনি বিরল প্রতিভার দ্বারা সর্বদা তাড়িত, যাঁর কলমের ডগায় সর্বদা উথলে উঠছে সংলাপী কবিতা, যিনি অনর্গল শব্দের সম্রাট—তাঁর পক্ষে কি সম্ভব গল্প ভেবে সময় নষ্ট করা? তিনি তো জানেনেই, হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ-এর মতো ধার-করা গল্পকেও তিনি পৌঁছে দিতে পারেন অনন্তের প্রান্তে। হ্যামলেট-কে নিয়ে একটি নাটক শেক্সপিয়র-এর হাতে এসেছিল নিঃসন্দেহে। এই ur-Hamlet কবে হারিয়ে গিয়েছে! হারিয়ে-যাওয়া নাটকটি অবলম্বনেই শেক্সপিয়র-এর হ্যামলেট। প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোকসাহিত্যের 'আমলেথ'-এর গল্প শেক্সপিয়র জানতেন, এ-গল্প পড়েছিলেন 'হিস্ট্রি অফ হ্যাম্বলেট'-এ। হ্যাম্বলেট স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোকসাহিত্যের এক বন্য নায়ক, যার সঙ্গে প্রায় কোনও মানসিক সম্পর্ক নেই শেক্সপিয়র-এর নবজাগরণ-সন্দীপ্ত দার্শনিক নায়ক হ্যামলেট-এর। ম্যাকবেথ-এর গল্পটাও শেক্সপিয়র হুবহু তুলে নিয়েছিলেন হলিনশেড-এর 'ক্রনিকল্স' থেকে। হলিনশেড-এর স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে ডনওয়াল্ডের বউ তার স্বামীকে উস্কে দিচ্ছে কিং ডাফ-কে মারতে। এমন একটা গল্পকে ছাড়তে পারেননি শেক্সপিয়র। ডনওয়াল্ডের বউটিকে চুরি করে এনে, শেক্সপিয়র তাঁর ম্যাকবেথ-এর বউ করে দিয়েছেন। ম্যাকবেথ-এর ডাইনিদেরও ধার করেছেন শেক্সপিয়র, অ্যানড্রু অফ উইনটাউন-এর 'দি ওরিজিনাল ক্রনিক্ল অফ স্কটল্যান্ড' থেকে, যেখানে তিন ডাইনির আবির্ভাব ঘটছে ম্যাকবেথ-এর স্বপ্নে। কেরিয়ার-এর একেবারে প্রথম থেকেই দেদার ধার করেছেন শেক্সপিয়র। 'শেক্সপিয়র ইন লাভ' ছবিতে এই রোমান্টিক ধারণায় আমাদের নিয়ে গিয়েছেন পরিচালক, যেন 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' শেক্সপিয়র-এর নিজের প্রেমজীবন থেকেই উঠে এসেছে। তা কিন্তু মোটেই নয়। শেক্সপিয়র-এর আগে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ইউরোপে চালু ছিল রোমিও এবং জুলিয়েটের গল্প। জুলিয়েটের নাম ছিল Giulietta। রোমিও আর জিউলিয়েত্তা-র গল্পের নানা সংস্করণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বিদগ্ধ শেক্সপিয়র। কিন্তু গল্পটা তিনি সরাসরি তুলে নিলেন আর্থার ব্রুক-এর 'রোমিয়াস অ্যান্ড জুলিয়েট' থেকে। এরপর শেক্সপিয়র যা করলেন তা ব্রুক-এর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। রোমিও এবং জুলিয়েট-কে অমরত্ব দান করলেন শেক্সপিয়র।

এমনকী শেক্সপিয়র-এর 'কিং লিয়ার' এবং 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা'-ও বিশুদ্ধ ধার। কিং লিয়ার নামের একটি সাধারণ কমেডিকে মহান ট্যাজেডিতে রূপান্তরিত করেছিলেন শেক্সপিয়র। আর অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা? এ-নাটক তো ঋণে-ঋণে জর্জর। যত নাম, তত ধার। অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা-র শেক্সপিয়র-এর প্রধান মহাজন হলেন প্লুটার্ক। টমাস নর্থ-এর অনুবাদে প্লুটার্ক পড়েছিলেন শেক্সপিয়র। নর্থ-এর বইটির নাম 'লাইভস অফ দ্য নোব্‌ল গ্রিশিয়ানস অ্যান্ড রোম্যান্স'। এমনকী লাইন, এমনকী শব্দবন্ধ, এমনকী চিত্রকল্প পর্যন্ত ধার করেছেন শেক্সপিয়র নর্থ-এর বইটি থেকে। অথচ তাঁর ম্যাজিক-প্রতিভার সৌজন্যে, যত ঋণ করেছেন ততই যেন ঋণমুক্ত হয়েছেন শেক্সপিয়র। প্লুটার্ক থেকে নর্থ থেকে ব্রুক থেকে হলিনশেড সবাই যেন শেক্সপিয়র-কে নতজানু হয়ে বলছেন, গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। শেক্সপিয়র-এর অলৌকিক প্রতিভা কী হালকাভাবে বহন করেছে ধারের বোঝা। কী সহজে সব ঋণ পেরিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে অন্তহীন মৌলিকতায়! এইখানেই উইলিয়াম শেক্সপিয়র-এর কোরক-বিরোধাভাস। তিনি আপাদমস্তক ঋণী। অথচ সন্দেহাতীতভাবে মৌলিক! তাঁর প্রতিভার জিয়ন-কাঠির স্পর্শে নতুন প্রাণ পেয়েছে পুরাণ, লোককথা, ইতিহাস, অন্যের লেখা গল্প। নতুন কাহিনির জন্য মাথা ঘামানোর সময় নেই তাঁর। তাঁর প্রতিভার অবিশ্বাস্য তোড় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। যা কিছু-ই স্পর্শ করছে তাঁর 'কুইল' বা পালকের কলম, তা-ই হয়ে উঠছে সপ্রাণ, এবং এই প্রাণসঞ্চারী স্পর্শেই শেক্সপিয়র-এর ঋণঋদ্ধ মৌলিকতা, তাঁর স্বাতন্ত্র্যের অনির্বেদ অভিজ্ঞান। হলিনশেড-এর 'ম্যাকবেথ' বা 'দি ওরিজিনাল ক্রনিক্ল অফ স্কটল্যান্ড'-এর ম্যাকবেথ-এ কোথাও আমরা পাই না পাপবোধে আক্রান্ত এক ক্রমিক-ক্লান্ত নিয়তিতাড়িত নায়ককে যে যত ডুবতে থাকে অন্যায়ের মধ্যে ততই হয়ে উঠতে থাকে বিশুদ্ধ কবি! ম্যাকবেথ-এর অন্যায়ের সঙ্গে, তার অপরাধচেতনার সঙ্গে যেন বিপরীত অনুপাতে উত্তীর্ণ হচ্ছে তার মুখের ভাষা, পৌঁছচ্ছে মৃত্যুহীন কবিতার শুদ্ধিতে

Tomorrow and tomorrow and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fauy,
Signifying nothing.

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোকসাহিত্যের হ্যামলেট (আমলেথ) শেক্সপিয়র-এর রেনেসা-রাজকুমার হ্যামলেটের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের মতো। মিলের চেয়ে গরমিল বেশি—এই দুই পুরুষের চারিত্রে, ভাবনায়, জীবনবোধে। আমলেথের মধ্যে নেই কোনও দার্শনিক দোলাচল। সে তার কাকাকে খুন করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গোড়া থেকেই বদ্ধপরিকর। তার স্বভাবে নেই হ্যামলেটের দীর্ঘসূত্রতা। তার তৎপরতার পথ আগলে দাঁড়ায় না



'ওথেলো' নাটকের একটি দৃশ্য

দার্শনিক আলস্য। তার মধ্যে নেই নবজাগ্রত মনের প্রশ্নখণ্ডিত, তর্কবিঘ্নিত, সংশয়ে কম্পমান দীপন। সে তার সঙ্গীদের খুন করে (হ্যামলেটের মতোই), ইংল্যান্ড থেকে একা ফিরে আসে, বিয়ে করে রাজার মেয়েকে। তারপর ছদ্মবেশে ঢোকে রাজপ্রাসাদে, সেখানে আমলেথের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে সবাইকে উদ্‌যাপনে আহ্বান করে। আমলেথের প্ররোচনায় সবাই মাতাল হয়ে যায়। সেই সুযোগে প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে কাকাকে খুন করে আমলেথ রাজা হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোকসাহিত্যের এই আমলেথের মধ্যে নেই কোনও বিপন্ন বিস্ময়। নেই কোনও প্রশ্নজর্জর নিভৃতি, আসঞ্জন, দ্বিধা। নেই বৈদগ্ধ্যের ব্যথা। আমলেথের মুখে কখনও উচ্চারিত হওয়া সম্ভব নয় হ্যামলেটের এই হৃদয়সংহিতা

To be or not to be—that is the question;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die, to sleep—
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to.

ওথেলো-র গল্পটা শেক্সপিয়র 'রেডিমেড' পেয়েছিলেন ইতালিয়ান লেখক চিনথিও-র (Cinthio) হেকাটোম্মিথি-তে। চিনথিও-র গল্পে কাফ্রি ক্যাপ্টেন ওথেলোর শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী ডিসডেমোনার (Disdemona) প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে ওই জাহাজেরই এক অফিসার। ফুসলাবার চেষ্টা করে তাকে। পারে না। তখন প্রতিশোধ নেয় ওথেলোকে এই কথা বুঝিয়ে যে ডিসডেমোনা জাহাজেরই এক অফিসারের শয্যাসঙ্গিনী। চিনথিও-র গল্পে ডিসডিমোনা ওথেলো-র সন্তানের মা। ডিসডিমোনা-র রুমাল-হারানোর ঘটনাও আছে চিনথিও-র কাহিনিতে। ওথেলো বালিভর্তি থলে দিয়ে মারতে-মারতে ডিসডিমোনাকে মেরে ফেলে চিনথিও-র গল্পে। পরে ডিসডিমোনার আত্মীয়রা ওথেলোকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। শেক্সপিয়র শুধু ডিসডিমোনার নামের বানানটাই বদলে তাকে ডেসডেমোনা করলেন না, ওথেলোকে করে তুললেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রথম কৃষ্ণবর্ণ ট্র্যাজিক নায়ক! তার কষ্টে আমরা কষ্ট পাই। তার শেষ



'ম্যাকবেথ' নাটকের তিন ডাইনি

পরিণতি দেখে আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে নতজানু হই। শান্তি কামনা করি তার আত্মার। এবং আমাদের বিস্ময়ের শেষ থাকে না যখন দেখি, যতই ওথেলোর মধ্যে জ্বলে উঠছে ঈর্ষার আগুন, যতই যন্ত্রণা পাচ্ছে সে অন্তরদহনে, ততই সে হয়ে উঠছে এক নিষ্ঠুর অবিস্মরণীয় কবি, তার ব্যক্তিগত দুঃখ, যন্ত্রণা, জিঘাংসা তাকে নিয়ে যাচ্ছে কবিতায়!

It is the cause, it is the cause, my soul—
Let me not name it to you, you chaste stars—
It is the cause. Yet I'll not shed her blood,
Nor scar that whiter skin of hers than snow,
And smooth as monumental alabaster.
Yet she must die, else she'll betray more men.
Put out the light, and then put out the light.
If I quench thee, thou flaming minister,
I can again thy former light restore,
Should I repent me; but once put out thy light,
Thon cunning'st pattern of excelling nature,
I know not where is that Promethean heat
That can thy light relume.

ডেসডেমোনা-কে খুন করার ঠিক আগের মুহূর্তে ওথেলোর এই স্বগতোক্তি স্পর্শ করে নক্ষত্রখচিত মহাশূন্য, হয়ে ওঠে আক্ষরিক অর্থে 'কসমিক'। এক নীরক্ত শীতল খুনকে শেক্সপিয়র শাশ্বায়িত করেন চিরায়ত কবিতায়!

অন্তহীন দ্রৌপদীর শাড়ির মতো শেক্সপিয়র-কে যাঁরা ক্রমাগত 'ধার' দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ওভিড, প্লুটার্ক, হলিনশেড, চসার। সমকালীন লেখকদের কাছ থেকেও ধার করতে কোনওরকম দ্বিধা করেননি তিনি। ঋণ করেছেন লিলি আর মার্লো-র কাছে; গ্রিন, লজ, সিডনি, স্পেনসার—এঁদের কাছেও পর্যাপ্ত ঋণ তাঁর। এবং কখনও কখনও সেই ঋণের ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। শেক্সপিয়র 'টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস'-এর মতো রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি লিখেছিলেন প্রথম জীবনে। এই নাটকের একটি দৃশ্যে মঞ্চে আনা হচ্ছে ওভিড-এর 'মেটামরফসেস'। তিনি যে প্রথম থেকেই ওভিড-এর মন্ত্রশিষ্য তা বোঝা যায়। কিন্তু যেখান থেকে যা-কিছুই ধার করে থাকুন শেক্সপিয়র, বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রতিভার আলো। ব্রুক-এর 'দ্য ট্র্যাজিকাল হিস্ট্রি অফ রোমিয়াস অ্যান্ড জুলিয়েট' এবং চসারের 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রিসিড'-এ ঘটনা ঘটছে মাসের পর মাস ধরে। শেক্সপিয়র-এর নাটকে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে। ফলে এতই দ্রুত হচ্ছে 'অ্যাকশন' যে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। শেক্সপিয়র জানেন কীভাবে পাঠক এবং দর্শককে আটকে রাখতে হয়। হলিনশেড-এর কাহিনিতে ম্যাকবেথ স্কটল্যান্ড শাসন করেন দশ বছর। শেক্সপিয়র এই সুখী দশ বছরকে শ্রেফ উড়িয়ে দিয়েছেন ম্যাকবেথ-কে আরও ভয়ঙ্কর এক শয়তানে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু তবু ম্যাকবেথকে আমরা মনে রাখি না শয়তান হিসেবে। মনে রাখি এমন একজন মানুষ হিসেবে যিনি আমাদেরই মতো বিপন্ন, অসহায়, নিয়তিনির্জিত। মনে রাখি এক পাপবিদ্ধ, চৈতন্যনির্যাতিত কবি হিসেবেও। তাঁর উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ তাঁকে যেন উদ্ধার করে সব পাপ থেকে।


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
06004
Rs 390/-
Genesis 2876
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street (033) 22861510/11 Free School Street (033) 22861506

অবলম্বনে ▲ ব্রাত্য বসু

নাটক-ফাটক, টুকে না-টুকে

স্থানীকরণ-এ বিদিশি বি-ভক্তি

১

রুশ সাহেব লিয়েবেদফ কলকাতায় এসে কলোনির কামিনদের দিয়ে যে দু'টি কলোনি 'থেটার' উপহার দিলেন সতেরশো পঁচানব্বই'তে—তার প্রথমটির নামেও রয়েছে ওই কলকাত্তাইয়া কলোনিয়াল অনুপ্রাস 'কাল্পনিক সংবদল'। এ-কথাও কাকতালীয় নয়, ওই যে দু'টি নাটক অভিনীত হল এজরা স্ট্রিট বা পঁচিশ নম্বর ডোমতলাতে, সেই দু'টিই আদতে অ্যাডাপ্টেশন। প্রথমটির রচয়িতা জনৈক জোড্রেল, নাটকটির নাম 'দ্য ডিসগাইজ' এবং দ্বিতীয়টি রুতকীর্তি মলিয়ের, নাটকের নাম : 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর'। অর্থাৎ এ-কথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য—এই ঔপনিবেশিক থিয়েটার, যে-বাচ্চাটির ভূত এবং বর্তমান দুই-ই আমরা এখনও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, তার প্রথম দু'টো নাটকই ছিল অ্যাডাপ্টেশন।

২

লিয়েবেদফ নিঃসন্দেহে কমার্শিয়াল ছিলেন। থিয়েটারকে তিনি শিল্প বা আমোদ হিসেবে শুধু দেখেননি, থিয়েটারের নিজস্ব নগদবিদায়ের বা দিন-আনি-দিন-খাইয়ের গপ্পোটা ভালই বুঝতেন। বুঝতেন বলেই লিয়েবেদফ পরবর্তীকালে তাঁর লেখা হিন্দুস্তানী ব্যাকরণ বই-এর ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, তিনি খেয়াল করেছিলেন 'এ দেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা, সে যতই বিশুদ্ধভাবে পরিবেশিত হোক না কেন—অনুকরণ, ভাঁড়ামি আর হাসিতামাশা বেশি পছন্দ করে, সেই জন্যই আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুখানি নাটকই নির্বাচন করেছিলাম।' অর্থাৎ একদিকে রগড়, আমোদ তথা তামাশাপূর্ণ অ্যাডাপ্টেশনের পথ অন্যদিকে সিরিয়াস নাটকের সিরিয়াস বঙ্গীকরণ—এই দু'টো পথই খোলা রেখেছিলেন এই রুশ নাট্যব্যবসায়ী—দুই খদ্দেরকেই চেয়েছিলেন তিনি। সাহেবও আসুক, নেটিভও আসুক। বাংলার প্রথম ডিরেক্টরের চাওয়ার এই বিশেষ প্যাটার্ন কী অদ্ভুতভাবেই না পরবর্তী রূপান্তর চর্চায় বাংলা থিয়েটারকে নানা খাঁজেখোঁজে উল্টেপাল্টে দিল, তা এক রহস্য।

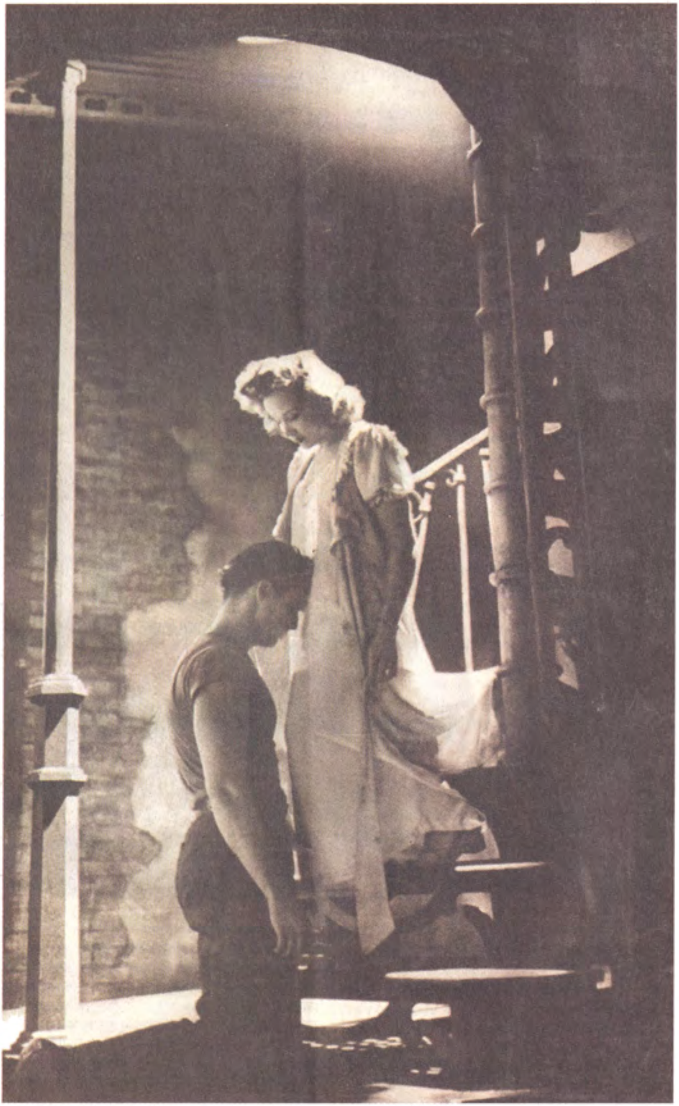
৩

অনুবাদের কুটুম অ্যাডাপ্টেশনের বাংলা তা হলে কী হবে? রূপান্তর? বঙ্গীকরণ? স্থানীকরণ? জোড্রেল-এর নাটকটার ঘটনা ছিল স্পেনে, লিয়েবেদফ তাকে পাল্টে করলেন কলকাতা আর লখনউ। এটা তা হলে খানিকটা বঙ্গীকরণ আর খানিকটা ভারতীয়করণ। যদি লিয়েবেদফ পুরো নাট্যবস্তু কলকাতা শহরে আঁটিয়ে নিতেন, আমরা বলতাম এ হল বঙ্গীকরণ তথা স্থানীকরণ। আর যদি তিনি জোড্রেলের বা মলিয়ের-এর নাটক দু'টিকে ওড়িয়া ভাষায় করে, ভুবনেশ্বরে ঘটনাটা পাল্টে নিতেন আমরা বলতাম বিলিতি বা ফরাসি নাটকের ওড়িয়াকরণ। আবার কেউ যদি 'ম্যাকবেথ'-কে অন্য পটভূমিকায়, অন্য প্রেক্ষিতে, অন্য চরিত্রচিত্রণে এমনকী অন্য শিল্পে বদলে নেন, তা প্রথমত রূপান্তর, এবং সেটা যদি অন্য কোনও ভাষায় অভিনীত হয় তবে হয়ে ওঠে, ধরা যাক 'মকবুল'—ম্যাকবেথ-এর হিন্দিকরণ। 'দর্পণ' যেমন পুব বাংলায় হ্যামলেট-এর এক বাঙাল বঙ্গীকরণ। ঋতুপর্ণ ঘোষ যেমন বাংলা নাটক 'আজকের সাজাহান'-কে রূপান্তর করেন 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এ, নাটকের রূপ রূপান্তরিত হয় চলচ্চিত্রে, ইংরেজি ভাষায় করা হয়—কিন্তু দু'টোর বিষয়বস্তু বঙ্গীকৃত-ই থাকে, কারণ দু'টোরই ঘটনাস্থল কলকাতা। অন্যদিকে রামগোপাল ভার্মা যখন রমেশ সিপ্পির 'শোলে'-কে নতুন সময়ে, নতুন বয়ানে হাজির করেন, ওই একই হিন্দি ভাষায়, তা হয়ে ওঠে 'রিমেক'। একই গল্প, একই ভাষা, এমনকী মাঝে মাঝে একই সংলাপ (ফারহান আখতারের 'ডন' স্মর্তব্য 'ডন কো পকড়না মুশকিল-ই নহি নামুমকিন হ্যায়')—শুধু সম্পূর্ণ নতুন উপস্থাপনা। অর্থাৎ রিমেক মানেই খানিকটা লোকালাইজেশন, কিন্তু লোকালাইজেশন মানেই রিমেক নয়। আরও খোলসা করে বলতে গেলে লিয়েবেদফ বঙ্গীকরণ করেছিলেন, ঋতুপর্ণ করেছেন রূপান্তর আর রামগোপাল ভার্মা করলেন পুনর্নির্মাণ। তিনটের কোনওটাই অনুবাদ না হলেও তার জ্ঞাতি-গুষ্ঠি তো খানিকটা বটেই। তত্ত্ব দিতে হলে আরও এইসব বিনির্মাণ-অবিনির্মাণ নানান কুটুম এদের মাঝে আসতে পারে, তবে তা এই তিন জ্ঞাতিভাইয়ের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করবে। এই তিনভাই হল লোকালাইজেশন, অ্যাডাপ্টেশন এবং রি-কনস্ট্রাকশন। ধরুন, যদি কেউ তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসকে বাংলার পটভূমিকায় ফেলে নতুন ত্রিকোণ সম্পর্কের উন্মোচন ঘটিয়ে নাটক করেন, আমরা তবে বলব, তিনি শুধু রূপান্তর করেছেন তা-ই নয়, তিনি স্থানীকরণও করেছেন। শুধু অন্য শিল্পে ট্রান্সফার নয়, তাকে লোকালাইজড্ করেছেন। অর্থাৎ আমরা বিষয়টা দেখতে চাইছি এইভাবে—



৪

লিয়েবেদফের পর বাংলা নাটক প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে (মৌলিক নাটক ছাড়া) প্রধানত হয় অনুবাদ, নয়তো বঙ্গীকরণের পথ বেছে নিয়েছিল। বঙ্কিম যেখানে স্কট-এর বঙ্গীকরণের ('দুর্গেশনন্দিনী') পাশাপাশি শেক্সপিয়র-এর রূপান্তর ঘটাচ্ছিলেন ('কপালকুণ্ডলা'), বাংলা নাটক সেখানে হয় সরাসরি অনুবাদ—ভবভূতি বা কালিদাস বা 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর বঙ্গীকরণ—'ভানুমতী চিত্তবিলাস' বা 'চারুমুখচিত্তহরা' ('রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট') ইত্যাদি থিয়েটারে কনসার্ট বাজাচ্ছিল। এই দুই বঙ্গীকরণের ভিসা-দাতা হরচন্দ্র ঘোষ। বাংলা উপন্যাসের প্রায় দশ বছর পরে (হরচন্দ্র-র লেখা দু'টি ১৮৫৩ এবং ১৮৬৪ এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা ১৮৬৪-তেই) বঙ্গীকৃত হল এবং গোড়াতেই ভাবনার এই অভিনবত্বে বাংলা নাটককে তা দু'গোল মেরে দিল। একদল, নাট্যকে রামনারায়ণ থেকে দীনবন্ধু থেকে মাইকেল মৌলিক বাংলা নাটক লিখতে চাইছেন; অন্যদিকে হরচন্দ্ররা বেকন বা হিউম বাংলায় অনুবাদ করলেও নাটক লিখতে বসে কোনও 'আইভান হো'-কে রূপান্তরের কথা ভাবতে পারছেন না। তার কারণ বোধহয় লিয়েবেদফের ওই প্রাগুক্ত ভূমিকায় যে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, তাতে পাওয়া যেতে পারে। পরে যখন গিরিশচন্দ্র



বিখ্যাত নাটক থেকে সিনেমা 'আ স্ট্রিটকার নেম্‌ড ডিজায়ার'। এই নাটকের বাংলাও হয়েছে—'ইচ্ছেগাড়ি'।

সরাসরি শেক্সপিয়র অনুবাদ করছেন, বা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে স্থানবিশেষে বঙ্গীকরণ করছেন (যেমন 'নূরজাহান'-এ 'হ্যামলেট' বা 'সাজাহান'-এ কিং লিয়ার) তখন-ও কেউ রূপান্তরের কথা ভাবছেন না। ডিকেন্স বা স্কট সরাসরি অধরা থাকছে। অথচ টেমপেস্ট-এর প্রথম বঙ্গানুবাদ হয়ে গিয়েছে সেই ফোর্ট উইলিয়াম আমলে—জনৈক ছাত্র মংকটন বাংলায় নামিয়ে দিয়েছেন ১৮০৯-এ। 'দুর্গেশনন্দিনী' যে-বছর প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে, সেই '৬৪-তে বারোটি নতুন বাংলা নাটক অভিনীত হচ্ছে বঙ্গদেশে—তার মধ্যে দশটি মৌলিক—একটি ওই হরচন্দ্র-র 'চারুমুখচিত্তহরা', অন্যটি সরাসরি অনুবাদ—নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী'।

৫

গুরুদেব অবশ্য অ্যাডাপ্টেশন-এর ধার কোনওদিন ধারেননি। সম্ভবত বিষয় নিয়ে তাঁকে কোনওদিন পীড়িত হতে হয়নি বলে। 'মালিনী'-র পর তিনি যে বারোটি বছর কোনও নাটক লেখেননি, তার কারণ বিষয় নয়, নাট্যাদর্শ। কিন্তু তিনি যে হাতড়াচ্ছিলেন ওরই মাঝে, তার প্রমাণ 'মালিনী'-র ছ'বছর পরে লেখা বিখ্যাত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ। তারও ছ'বছর পরে ১৯০৮ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধরনটাই বদলে গেল। হ্যাঁ, ওই ধরনটাই—ফলে 'শারদোৎসব' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত নানা উপাদান—বৌদ্ধ কাহিনি থেকে রূপকথা—তাঁর নাটকে এসেছে, মঞ্চসজ্জার বিবরণ ব্র্যাকেটে ক্রমশ তাঁর নাটকে নিরাভরণ হয়েছে, কিন্তু ওই অ্যাডাপ্টেশনের ঝামেলিতে তিনি কোনওদিন ঢোকেননি। অনেকে অবশ্য 'ডাকঘর'-এ মেতারলিঙ্ক-এর প্রভাব দেখতে পান, তবে তা ওই প্রভাবই, যা হয়তো মেতারলিঙ্কের ওপর রবীন্দ্রনাথেরই বেশি আছে। রবীন্দ্রনাথ, তিনি আসলে খুঁজছিলেন কমিউনিকেশনের একটি নতুন 'নাট্যাদর্শ'—তাঁর মতো সৃজনশীল চিন্তকের পক্ষে যা সবচেয়ে স্বাভাবিক। ফলে, আমার বিবেচনায়, ১৯০৮ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনায় যে নতুন ধরনের টেক্সট জন্ম নিল—তা শুধুমাত্র কোনও নাটককারের রূপক-সাংকেতিক-প্রতীকী কণ্টকিত শব্দগুচ্ছের ঝনঝনানিতে আটকে থাকা পি এইচ ডি-র সমারূঢ়তা নয়, বরং তা একজন নাট্য-নির্দেশকের নতুনভাবে কমিউনিকেশনের নতুন টেক্সট, রবীন্দ্রনাথই তাবৎ পৃথিবীতে সেই প্রথম আভাঁ গার্দ নাট্য-পরিচালক—যাঁর কমিউনিকেশন ও টেক্সট ভাবনাকে যদি আঁতিপাঁতি করে খোঁজা যায়, তা হলে দেখব ওই কলোনির বাচ্চার জামাকাপড় খুলে নিয়ে যে নতুন আলখাল্লা তিনি পরালেন—তার সঙ্গে পরবর্তী কালে মেয়ারহোল্ড থেকে ব্রেশ্‌ট, গ্রোটস্কি থেকে শেখ্‌নার বা বাদল সরকার সবার নাট্যভাবনা তথা সংযোগ-ভাবনা কোনও না কোনওভাবে সন্নিধি খুঁজে পাবে। একজন সত্যিকারের মৌলিক চিন্তক, যিনি তাঁর চিন্তা, পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে কমিউনিকেট করাতে চান এবং তার জন্য একটি বিশেষ প্যাটার্ন যিনি স্থিরীকৃত করতে চান, তিনি অ্যাডাপ্টেশনের বঙ্গজ গোলকধাঁধায় ঢুকবেন কেন—যেখানে 'সাহেব কইছে পুঙ্গির ভাই'-এর দল বসে আছে, ওই বুঝি পো-এর গল্প ঝেড়ে তিনি 'নিশীথে' নামিয়ে দিলেন, বা স্ট্রিন্ডবার্গ-কে হাততালি মেরে 'রক্তকরবী'! ফলে তাঁর নাটকের সোর্সের মধ্যে যে ভূত আমরা খুঁজি, তা সৃজনের একটি বিশেষ রসায়ন—তিনি অনেক বেশি চিন্তক, অনেক বেশি নাট্য পরিচালক, যতটা না তিনি নাটককার। নাটকগুলির শিল্পগুণ কতখানি তা অবশ্য ওই সমারূঢ়তার আচ্ছন্ন ছায়াপিণ্ডদের ওপর ছেড়ে রাখাই ভাল।

৬

শিশিরকুমার ভাদুড়ি যদিও তা পারতেন। স্থানীকরণের উপযুক্ত টেক্সট পড়ার কোনও অভাব বা অসুবিধে তাঁর ছিল না। কিন্তু ওই যে নগদবিদায়ের গল্প! ফলে তিনি বেছে নিলেন রূপান্তরের পথ, বঙ্কিম বা শরৎচন্দ্রের আখ্যাননির্ভর উপন্যাসগুলিকে তিনি প্রসেনিয়ামের ফ্রেমে আঁটিয়ে নিতে শুরু করলেন, যেখানে একটি টানা গপ্পো থাকবে এবং অভিনয়ের জোরদার প্যাঁচপয়জার দেখানোর পরিসর থাকবে। বরং শিশিরকুমারের অসমাপ্ত কাজ পরবর্তীকালে অনেকটাই সম্পন্ন করলেন, ওই নগদবিদায়ের ছক্কাপাঞ্জার বোর্ডে থেকেও, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনেক বছর বাদে তাঁর স্থানীকরণে আইরিশ শন ওকেসি থেকে জার্মান ড্যুরেনমাট বা মার্কিন লিলিয়ান হেলম্যান (কে নয়?) বাংলার বোর্ডে এলেন। শিশিরকুমার যে-ভিত প্রস্তুত করেছিলেন, লিয়েবেদেফের দেওয়া ওই সিদ্ধান্তর হাতুড়ির কারণে তিনি যা করতে পারেননি, সেই কাজ-ই যেন সম্পন্ন করলেন সৌমিত্র। ওই মৃতবৎ বৃহৎ কলোসাস-সুলভ রোমক সাম্রাজ্যের 'লাস্ট অফ দি মহিক্যান্‌স'—তিনিই, যিনি এখন মহেশ এলকুঞ্চওয়ার-এর স্থানীকরণে রত। এই বিশ্বায়ন, এই আমরা-ওরা, এই উত্তর-ঔপনিবেশিকতা উত্তর-আধুনিকতা, এই নাশকতা ইত্যাদি গর্জনশীল শব্দের কাঁচড়া, সিরিয়াল-সিনেমা-শুটিংয়ের দৈনন্দিন উপার্জন ও সহ্যক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি গোলকধাঁধাকে মেনে নিয়ে তিনি যেন ব্রেশ্‌ট-এর সেই গ্যালিলিও, বন্দি অবস্থাতেও লুকিয়ে যিনি লিখে চলেছেন 'ডিসকোর্সি।'



৭

প্রয়াত বিশিষ্ট সমালোচক ধরণী ঘোষ, একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর এই যে এত অ্যাডাপ্টেশন এবং স্থানীকরণ শুরু হয়েছিল এ-বাংলার থিয়েটারে, তার কারণ নাকি গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে ফরেন বুক পাবলিশার্স-এর দোকানটি। সেখানে সস্তায়, প্রায় ফোকটে, প্রচুর বিদিশি নাটক আসত, আর এখানকার নাটককাররা সেখান থেকে ঝপাঝপ স্থানীকরণ করে নিতেন। অনেকটা এখন যেমন বাংলা চলচ্চিত্রে তামিল ছবির সিডি থেকে বাংলা ছবির দুর্মুখ-গুরমুখরা বা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাই বাংলা ছবি বানাচ্ছেন। কিন্তু এ-কথা অন্তত উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র বা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে খাটে না। উৎপল কিন্তু অ্যাডাপ্টেশন করেছেন— শ'এর 'মিসেস ওয়ারেনস প্রফেশনস' থেকে 'মধুচক্র' বা ইয়ান পিটারসনের জার্মান নাটক 'উনসেরে স্ট্রাসে' থেকে 'ব্যারিকেড', বা মার্কিন নাটককারদ্বয় কফম্যান ও হার্ট-এর 'দ্য ম্যান হু কেম টু ডিনার' থেকে 'ভি-আই-পি'। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই নাটকগুলির থেকে তাঁর 'মানুষের অধিকারে' বা 'টিনের তলোয়ার' অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।



ডেনমার্কের 'হ্যামলেট' বাংলায় 'হেমলাট'

মনোজ মিত্র-র ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও তাৎপর্যবহ। তাঁর দল 'সুন্দরম' গোড়ার দিকে সম্ভবত ওই গ্র্যান্ড হোটেল বাহিত অ্যাডাপ্‌টেশন কিছু কিছু মঞ্চস্থ করত। প্রধানত পার্থপ্রতিম চৌধুরী, তিনিই পরিচালক, যেমন 'রূপান্তর' করেছিলেন (হিচকক-এর 'ডায়াল এম ফর মার্ডার' থেকে 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু') তেমনই মার্কিন এডওয়ার্ড অলবি-র 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উল্‌ফ' থেকে স্থানীকরণ 'মলাটের রং মুহূর্ত'-ও তাতে ছিল। কিন্তু পার্থপ্রতিম পুরোপুরি চলচ্চিত্রে চলে যাওয়ার পর মনোজ মিত্র-র 'সুন্দরম' আর একটিও অ্যাডাপ্‌টেশন কখনও করেনি। সম্ভবত এটাই সেই মৌলিকতার অন্বেষণ, যখন ওই বাচ্চাটি দেড়শো বছরের মেয়াদ পার করে নতুন জামা গায়ে দেওয়ার কথা ভাবল। মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালরা যে নিজস্ব কণ্ঠের খোঁজ করেছিলেন, তা ছিল সামাজিক পরাধীনতার সঙ্গে শিল্পের স্বাধীনতার টাস্‌ল, অন্যদিকে উৎপল-বাদল-মনোজ-মোহিতদের অন্বেষণ ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক-আঙ্গিক ইত্যাকার সমস্ত পরাধীনতার সঙ্গে শিল্পের স্বাধীনতার টাস্‌ল। প্রথম গোষ্ঠীর চর্চার মধ্যে জাতীয়তাবাদ নামক আশাবাদ নিহিত ছিল, সেই সূত্রেই যাবতীয় অ্যাডাপ্‌টেশনের আগমন; দ্বিতীয়

গোষ্ঠীর চর্চার মধ্যেও আন্তর্জাতিকতা নামক আশাবাদ নিহিত ছিল—সেই সূত্রেই যাবতীয় অ্যাডাপ্টেশনের আগমন, আর এই দুই গুচ্ছের সেতুবন্ধন করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যাঁর মধ্যে ওই জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ—দু'টি পৃথক ফলিত দর্শন সমন্বয় খুঁজেছে। গত শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর পার করে প্রথম আশাবাদটি সলিলসমাধি যখন পেল, পরের পঞ্চাশটি বছর দ্বিতীয় আশাবাদটিকে আঁকড়ে ধরল এবং গত শতাব্দীর শেষে এসে তারও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। এই নতুন শতাব্দীতে তাই ওই অ্যাডাপ্টেশন আর পুরনো কোনও খোলসে আটকে থাকতে চাইছে না, সমস্ত রকমের ধ্বংসকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর, সে নতুন জামা আবার খুঁজছে, ওই 'নিরাশা' বা 'আশা' নামক হাস্যকর শব্দপুঞ্জের মধ্যে আটকে না-থেকে স্বাভাবিক কোনও কণ্ঠের চর্চা করতে চাইছে। এখন নাটকের ওই দু'গোল ফেরত দেওয়ার পালা—রেফারি নির্দিষ্ট জায়গায়—সবে হালকা গা ঘামানো চলছে।

বাদল সরকার এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। দু'জনেই দু'রকম করে অ-পূর্ব আত্মীকরণকারী। 'মৃত্যুসংবাদ' বা 'তখন বিকেল' যদি শুধু পাঠ করা যায়, বোঝা যায় না কে পাস বাড়াচ্ছে আর কে-ই বা গোল দিচ্ছে। মাঝে-মাঝে মনে হবে সিংগ বা আরবুজভ-ই যেন মোহিতের ওই নাটক দু'টিকে অবলম্বন করে 'প্লে বয় অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' বা 'ওল্ড ওয়ার্ল্ড' লিখেছেন! বা, বাদল সরকারের লেখা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কমেডিগুলি। 'বল্লভপুরের রূপকথা' বা 'রাম-শ্যাম-যদু' দু'টি-ই রূপান্তর, চলচ্চিত্র থেকে স্থানীকরণ। কিন্তু লিখনশৈলী, প্রসাদগুণ আর রসে-চোবানো সংলাপ পড়লে এবং উৎস যদি জানাও থাকে—কে বলবে, আদৌ এর কোনও সোর্স ছিল! 'থিয়েটার বুলেটিন' পত্রিকায় এক সময় জনৈক রহস্যময় রফিকুল ইসলাম এবং 'জপেনদা জপেন যা'-তে স্বয়ং উৎপল দত্ত এই দু'জনের তৎকালীন ধরনকে আক্রমণ করেছিলেন, সাহিত্যের সঙ্গে থিয়েটারের এক ধরনের সাময়িক ডিভোর্সের তখনই সূত্রপাত—কিন্তু উৎপল নাটক বলতে যা ভাবতেন, এঁরা তা ভাবতেন না। আবার এঁরা নাটক বলতে যা ভাবতেন, উৎপলের পক্ষে ভাবা তা কঠিন ছিল। যাই হোক ওই সময়ই 'থিয়েটার বুলেটিন'-এর এক সংখ্যায় বলা হয়েছিল বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি 'উই গট রিদম' শীর্ষক বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণ, যা পরে অবশ্য আর কেউ কখনও বলেননি। দু'টি নাটক পাঠ করলে তা অবশ্য মনে হয় না। জীবনানন্দ যদি 'বোধ'-এ আক্রান্ত হয়ে 'আট বছর আগের একদিন' দেখতে পারেন, কিয়র্কেগার্দ-নিৎশে-হাইডেগার জনপ্রিয় হওয়ার অতদিন আগে, বেচারা বাংলা নাটকের তা হলে দোষ কোথায়? যাই হোক বাদল সরকার পরবর্তীতে বার্নার্ড শ' ভেঙে 'আন্দ্রেক্লিস ও সিংহ' করেছেন, কিন্তু তাঁর থার্ড থিয়েটার দর্শনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আত্মীকরণ ব্রেশটের 'দ্য ককেশিয়ান চক সার্কল' অবলম্বনে 'গণ্ডী'—সম্ভবত বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ ব্রেশট-স্থানীকরণ। অন্যদিকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ইন্দিরা পার্থসারথি-র 'আওরেঙজেব' যেভাবে আড়ষ্ট অনুবাদের শাঁস ছাড়িয়ে সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী করে তুলেছেন তা-ও স্মর্তব্য। স্মর্তব্য, গত শতাব্দীতে বাংলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য আত্মীকরণের কাজ। তার মধ্যে বিভাস চক্রবর্তীর কথা প্রথমেই মনে পড়ে। ব্রেশট অবলম্বনে 'পাঁচু ও মাসি', 'নাজির বিচার' তো বটেই, সরাসরি অনুবাদ 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' বা গিরিশ করনাড়-এর 'অগ্নিজল' বা দারিও ফো-র দুই বঙ্গীকরণ—'হচ্ছেটা কী' এবং 'মৃত্যু না হত্যা'। 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা'-কেও রূপান্তর-ই বলা যেতে পারে, কারণ ময়মনসিংহগীতিকা এখানে রূপ পাচ্ছে নাট্যের। অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁর গুরু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সার্থক উত্তরসূরি। অজিতেশ যেমন শেখভ থেকে ব্রেশট থেকে পিরানদেল্লো সবই আত্মসাৎ করেছিলেন, অশোক মুখোপাধ্যায়ও তেমনই এরিস্টোফেনিস থেকে ওয়েস্কার বা অনুবাদে অগাস্ট উইলসনের 'ফেন্সেস' থেকে বেড়া-তে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'সায়ক'-এর তত্ত্বাবধানে চন্দন সেন কৃত তলস্তয়ের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' বা শেড্রিন-প্রাণিত 'দুই হুজুরের গপ্পো'-র কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় উগো বেত্তি-র 'রাণীকাহিনী' বা টেনেসি উইলিয়ামস-এর 'ইচ্ছেগাড়ি'-র কথা। প্রয়াত অসিত মুখোপাধ্যায়ের শেখভ বা মিলার-এর 'ভস্ম' (নভেন্দু সেন কৃত) এবং 'নীলাম নীলাম'-ও মনে পড়ে। মনে পড়ে 'বহুরূপী'-র 'মিঃ কাকাতুয়া' বা 'আগুনের পাখি'-র কথা। সর্বোপরি 'নান্দীকার' তথা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তাঁর চর্চায় পিরানদেল্লো ('নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র') ব্রেশট ('শঙ্খপুরের সুকইন্যা', 'খড়ির গণ্ডী') আর্থার মিলার ('ফেরিওয়ালার মৃত্যু', 'গোত্রহীন') পিটার টার্সন ('ফুটবল') স্লাদলেন দোজরেৎসেভ ('শেষ সাক্ষাৎকার') ইত্যাদি স্থানীকরণ, এবং রূপান্তর মাননীয় 'বিচারকমণ্ডলী' (কুরোশাওয়া-র 'রশোমন' অবলম্বনে) বা অনুবাদ (সফোক্লিস-এর 'আন্তিগোনে') প্রভৃতি কাজ মনে রেখে দেওয়ার মতো।

৮

এই শতাব্দীতে এসে, এ-বাংলার নতুন প্রজন্মের নাটককার, পরিচালকরা অনুবাদে আর আস্থাশীল ততটা নন, বরং রূপান্তর তথা স্থানীকরণে তাঁরা আগ্রহী বেশি। কৌশিক সেন করেন 'মাল্যবান' রূপান্তর, আবার 'ময়দানব' (ইবসেন-এর স্থানীকরণ) সুমন মুখোপাধ্যায় করেন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (রূপান্তর) 'মেফিস্টো' (অনুবাদ), বা 'আগুনমুখো' স্থানীকরণ। অর্পিতা ঘোষ করেন 'পশুখামার' (রূপান্তর), 'একটি রাজনৈতিক হত্যা' (অনুবাদ); বা 'টোকোলাশ' (রূপান্তর); মণীশ মিত্র করেন 'রায়ট' (রূপান্তর) বা 'শেষ রূপকথা' (রূপান্তর) বা 'সীমার' (রূপান্তর)। কিশোর সেনগুপ্ত করেন 'চিলেকোঠার সেপাই' (রূপান্তর), 'খোয়াবনামা' (রূপান্তর) বা 'অশ্বচরিত' (রূপান্তর); বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় করেন 'আঁধারে একেলা' (স্থানীকরণ)। এরকম নানা ধরন, নানা খাঁজখোঁজ—সময় এসেছে কলোনির ওই বাচ্চার পুনর্জন্ম নেওয়ার।

বাংলা শব্দের কী আশ্চর্য বিচারবোধ! এখানে কবিতার সঙ্গে মেলে টবিতা, গানের সঙ্গে ফান, ছবির সঙ্গে টবি, কিন্তু কী অবশ্যম্ভাবীভাবে নাটকের সঙ্গে ফাটক! এ মানে ভাবাই যায় না! ফলে ঐতিহাসিকভাবে নিজের প্রতি নির্মোহ থেকেই এ তথ্য জানাতে হবে যে, ভারতবর্ষে কোনও শিল্পমাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা একটি নাটকের পুনর্নির্মাণ ঘটেছিল এই বাংলাতেই যখন উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকারে' থেকে তৈরি হয়েছিল '১৭ই জুলাই'। রামগোপাল ভার্মা বা ফারহান আখতার চলচ্চিত্রে 'আগ' বা 'ডন' করার অনেক আগেই। 'মানুষের অধিকারে' ছিল মার্কিনদেশের আলাবামা প্রদেশের সাদা-কালো দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা একটি নাটক। এই শতাব্দীর গোড়ায়, গুজরাট-কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর, 'মানুষের অধিকারে'-র বর্ণ-বিভাজনকে পালটে, সাম্প্রদায়িক বিভাজন অবলম্বনে ২০০৪-এ করা হয়েছিল '১৭ই জুলাই'। বাংলা ভাষার প্রথম রিমেক। সেইসঙ্গে এ-কথাও জানালে খুব খারাপ হবে না যে, 'রিমেক'-এর আরেক কুটুম 'বিনির্মাণ' বাংলা নাটকে শেক্সপিয়র-চর্চায় নতুনভাবে এল—যখন হ্যামলেট-এর গল্পের নির্যাস আত্মসাৎ করে ২০০৬-এ তৈরি হল 'হেমলাট—দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা'। ডেনমার্কের প্রিন্স নেমে এলেন তৃতীয় বিশ্বে, পাজামা আর শার্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে। কিন্তু ওই যে বললাম, বাংলা শব্দের তথা বাঙালির কী আশ্চর্য বিচারবোধ! তাই আমরা 'ফাটকবন্দি' হয়ে আপাতত দেখছি আর ভাবছি কলোনির ওই বাচ্চার কীভাবে, কোন কোন পদ্ধতিতে পুনর্জন্ম হতে পারে! আর তার জ্ঞাতি-কুটুমরাই বা কীরকম চেহারা নিতে যাচ্ছে!


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
06013
Rs 390/-
Genesis 2877
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street (033) 22861510/11 Free School Street (033) 22861506

অবলম্বনে ▲ শান্তনু চক্রবর্তী

ক্রমে আলো না আলো ক্রমে

মূল পাঠের রশ্মি বা কিরণ একটু এদিক-ওদিক ফেললেই অনেকে ক্যাঁওম্যাঁও জুড়ে দেন। কেউ বলেন, আলোর রং পাল্টে না দিলে ছায়াবাজি জমবে না।

চেতন ভগত কা গুস্‌সা কেন ব্লগ-এ ব্লগ-এ, হেডলাইনে-হেডলাইনে ভসভসিয়ে আতা হ্যায়, সেটা এক্ষুনি এই দেশকে কোণে কোণে মে, ছেলে অথবা বুড়ো, পাক্কা 'ইডিয়ট্‌স' কিংবা 'সহস্রবুদ্ধি', সক্কার কমা-দাঁড়ি-সেমিকোলন সুদ্ধ মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ও-সব 'ব্লগিয়' বা কাগুজে কাসুন্দির বাসি ঢেকুর তোলার তাই আর কোনও মানেই হয় না। তার চেয়ে বরং 'বেসড অন', মানে 'অবলম্বনে' অবলম্বনে এই প্রলম্বিত বিতর্কটির পেছন থেকে গ্রীবা-উঁচোনো এম-ও-আর-এ-এল 'মরাল'-টিকে টুক করে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে বিবাদী পক্ষ মানে বিবিসি মানে বিধুবিনোদ চোপড়া অ্যান্ড কোম্পানি প্রথম থেকেই চোখ-টোখ রাঙিয়ে, চুক্তির কাগজ-টাগজ ওয়েবসাইট-এ টাঙিয়ে, অনেক বেশি যুদ্ধ-যুদ্ধ মেজাজে ভরপুর! বাকি চেতন ভগত-ই বরং পুরো ইস্যুটা নিয়ে কেমন একটা লজ্জিত-বঞ্চিত, ছলছল-টলটল, আবেগ-থসথসে, মেলোড্রামা-প্রবণ হয়ে আছেন! যেন একটা টোকা মারলেই ব্যাকগ্রাউন্ডে এক্ষুনি চ্যাঁ-চ্যাঁও, প্যাঁ-প্যাঁও করে করুণ বেহালা আর কাতর বাঁশির কনসার্ট বেজে উঠবে!

তবে তিনি যতই বিষাদ-জর্জর, শোক-থরথর হন, তালে একদম ঠিক আছেন! তাই ব্লগে মোক্ষম প্রশ্নটাও ঠিকঠাক ছুড়ে দিয়েছেন। 'থ্রি ইডিয়ট্‌স' যদি কাহিনির জন্য কোনও ফিল্মি অ্যাওয়ার্ড পায় তা হলে পুরস্কারটা নিতে মঞ্চে কে উঠবেন—'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান' উপন্যাসের লেখক হিসেবে তিনি চেতন ভগত, না কি ছবির ক্রেডিট টাইটেল মাফিক কাহিনি-চিত্রনাট্যকার অভিজাত যোশী? এখন সেটা জানতে গেলে তো আমাদের আরও কয়েকটা মাস অপেক্ষা করতেই হবে, যখন চ্যানেলে-চ্যানেলে ফিল্মি-অ্যাওয়ার্ডের হল্লাগুল্লা শুরু হবে! কিন্তু আমরা যেটা জেনে গেলাম, সেটা হল, 'থ্রি ইডিয়ট্‌স'-এ অভিজাত আর রাজকুমার যেভাবে 'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান'-কে ঘেঁটেঘুঁটে ঘন্ট পাকিয়ে, সেখান থেকে কয়েক চামচ জরুরি তথ্য-ঘটনা ছেঁকে নিয়ে, তাতে বলিউডি ইচ্ছাপূরণের তেল-মশলা ব্যাপক ঢেলে, সেটাকে শহুরে 'ক্লাস' বিনোদনের ঢিমে, আলতো-এলিট আঁচে, 'বক্স অফিস' মেগা হল্লোড়ের দম-পক্ত রেসিপিটা পাকিয়েছেন, যেখানে 'ফাইভ পয়েন্ট'-এর দেড় পয়েন্টও পড়ে আছে কি না সন্দেহ, এবং সেটা নিয়ে চেতন ভগতের কোনও হেলদোল, ক্ষোভ, অপমান, রাগ কিচ্ছু নেই। বরং টায়ার-ইঞ্জিন-ছাদদরজা খুলে নিয়ে মায় চেসিস অবধি টিপেটুপে টেগো বানিয়ে দেওয়া, টুটা-ফুটা ন্যারেটিভ-টার আসলি ক্রেডিট তাঁর পকেটে কেন গেল না, সেই নিয়েই তিনি অভিমানে ঠোঁট ফোলাচ্ছেন।

এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, লেখক চেতন ভগতের ঔপন্যাসিকত্ব নিয়ে অনেক মহলে যতই চোখ-মটকানো, ঠোঁট-ওল্টানো, নাক-কুঁচকোনো থাকুক, তাঁর পোস্টমর্ডানত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই! না, দেশি-মেট্রো ইংরেজিতে, একুশ শতকের গ্লোবাল ভারতীয় যৌবনের জন্য, একুশ শতকীয় নাগরিক উপকথার লেখক হিসেবে বলছি না! চেতন ফুকো-দেরিদার মন্ত্রশিষ্যত্ব নিয়েছেন অন্য জায়গায়! তিনি নিশ্চয়ই গত শতকের ঈশ্বরপ্রতিম সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান, শ্রীমৎ ভগবৎ 'লেখকমশাই'-এর অকালমৃত্যুর তত্ত্বটি কোথাও গিলে নিয়েছেন।

মহামহিম লেখকবাবুর অথরশিপ-এর মৌরসিপাট্টা-টি হাসি মুখে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই 'তিন ইডিয়ট' মিলে ভারতীয় প্রকাশনা দুনিয়ার সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়া তার মাঠের বেস্টসেলারটির মূল টেক্সট-এর ওপর দিয়ে সিনেম্যাটিক লাইসেন্স-এর রোডরোলার চালিয়ে দিলেও তিনি ভুরুটুকু কুঁচকোননি! এই পোস্টমডার্ন নির্বিকল্প সমাধির স্তরে পৌঁছে গেলে 'অবলম্বনে'-র আর তখন কোনও অবলম্বন লাগে না! পরদ্রব্যও তখন দিব্যি আত্মভূতেষু! 'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান'-এর যে নায়ক, প্রোফেসর-সাহেবের ডেরায় ঢুকে, তার মেয়ের সঙ্গে শুয়েটুয়ে খোদ প্রোফেসরেরই পাজামা পেছনে গলিয়ে দিব্যি কেটে পড়ে; সিনেমায় সেই ছেলেই প্রেমের খেলায় একান্ত আনাড়ি—এমনকী স্বপ্নেও চুমুটা ঠিকঠাক খেতে পারে না।



'চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথ থেকে প্যাশনের লীলা। বহু দূর যাত্রা?

এদিকের চুমু ওদিকে গড়িয়ে যায়—মাঝখানে নাকি নাক এসে ঝামেলা পাকায়! নভেলের প্রাপ্তবয়স্ক লাভ-মেকিং 'ইউ' মার্কা পারিবারিক 'হোলসাম' বিনোদনের চাপে, এইভাবেই লেখকের নাকের ডগায় খোকা-রোমান্সের নরুন হয়ে যায়! 'বেস্‌ড অন'-এর বেস-টেস সব ভেঙেচুরে মাঠ হয়ে যায়! লেখক তবুও ক্রেডিট টাইটেল-এ নামটা ওপরে না নীচে গেল, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিতে বেশ থাকেন!

তবে গত শতাব্দীর লেখকরা যেহেতু তথ্য-প্রযুক্তি তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য যথাসময়ে লেখক-কুলের 'মৃত্যুসংবাদ'-টি পাননি, তাই তাঁরা অবলম্বিত সিনেমার মুখ থেকে 'অবলম্বনে'র ঘোমটা-টা এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই রীতিমতো রিঅ্যাক্ট করতেন! ১৯৬৯-এর প্রায় ছোকরা লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন তাঁর একটা খুদে উপন্যাস 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র ওপর স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের খোদকারিও মেনে নেননি। রীতিমতো ছাপার অক্ষরে তাঁর ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। আবার পরে সেই ছাপার অক্ষরেই মেনে নিয়েছিলেন, উপন্যাসের ন্যারেটিভটাকে নেড়েঘেঁটে, ভেঙেচুরে সত্যজিৎ ছবিটাকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁর লেখা উপন্যাসটা তত দূর ছুঁয়ে দেখতে পারতই না। এখন সেটা হতেই পারে। 'অরণ্যের দিন রাত্রি' তো কোনওভাবেই সুনীলের মেজর গদ্য-লেখাগুলোর মধ্যে পড়ে না। অন্যদিকে সত্যজিতের ছবিটা একাধিক বিদেশি ফিল্মস্কুলের 'অবশ্যপাঠ্য' চলচ্চিত্র-টেক্সট। সুনীল তাঁর উপন্যাসে মধ্যরাতে কলকাতা শাসনকারী বেপরোয়া যুবকবাহিনীকে বিনা টিকিটের ট্রেনে চাপিয়ে ছোটনাগপুর রওনা করে দিয়েছিলেন। সেখানে হাঁড়িয়া-দেশি দারু-সাঁওতাল মেয়ের কৃষ্ণযৌবনে আকণ্ঠ বুঁদ, মত্ত-মুক্ত, শহুরে-জংলি অ্যাডভেঞ্চারটাই সুনীলের মাখো-মাখো, আলতো-নরম, স্মার্ট, মায়াময় গদ্য-সফরে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

সত্যজিৎ কিন্তু ছবিতে এই নরম, মায়াভরা রোমান্টিক মুডটাই পাল্টে ফেললেন। তাঁর ছবিটা যেমন কোথাও 'পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে' আসা 'ড্যাঞ্চি' বাঙালি বাবুদল কর্তৃক সঞ্জীবচন্দ্র (বঙ্কিম-ভ্রাতা) অনুপ্রাণিত পালামৌ-আবিষ্কার হয়ে ওঠেনি; তেমনি ভয়ঙ্কর সুন্দর জঙ্গলের ব্যাকড্রপে নাগরিক মর্মবেদনার ঝাঁপি খোলার ক্লাসিকাল চেষ্টাও ছিল না। আসলে সম্ভবত এই প্রথম তাঁর ছবি থেকে সেই উনিশ শতকের 'রেনেসাঁ পুরুষ'-এর (সত্যজিৎ সম্পর্কে দেশি-বিদেশি আলোচনাকাররা প্রায়ই সেটা বলে থাকেন) স্বভাবগত মায়া ব্যাপারটাকেই বাদ দিয়ে দিলেন! তাঁর ছবির চরিত্রদের সঙ্গে সত্যজিতের যে নরম ইনভলভমেন্ট-টা এতদিন ঘটে এসেছে, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে সেটা কোথাও হয়নি। এখানেই সুনীলের টেক্সট-এর সঙ্গে সত্যজিতের ট্রিটমেন্ট-



এর একটা মস্ত তফাত হয়ে গিয়েছে। উপন্যাসে যে চারজন যুবক কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিল, সেই দলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে ভীষণভাবে ছিলেন—ফিজিকালি এবং মনে-মনেও। ফলে যুবকেরা যা করছে, যা হচ্ছে, তার একটা সূক্ষ্ম সাফাই দেওয়ার দায় লেখকের থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু সত্যজিৎ এখানে দায়হীন, নির্মোহ, নির্মম গবেষকের মতো। উপন্যাসের টেক্সটা যেন তাঁর ল্যাবরেটরি। আর চরিত্রগুলো যেন নানারকম কেমিকাল-রঞ্জক-অ্যাসিড-অ্যালকালি! মায় জঙ্গলটা অবধি। 'পথের পাঁচালী'-তে অনেক অ-সুখ, অনটন, অপমানের মধ্যেও পুকুরের জলে জল-ফড়িঙের লিরিকাল নাচনটুকুও যাঁর নজর এড়ায়নি; তিনি এখানে জঙ্গলকে স্রেফ তাঁর রসায়নাগারের ক্যাটালিস্ট এজেন্ট বা অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করেছেন! উপন্যাসের রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজটাই তাই তিনি কোথাও রাখেন না। অথচ সারাক্ষণ একটা কষটা-আঁশটে-তিতকুটে নাগরিক উইট-এর আঁচে দর্শকদের সেঁকতে-সেঁকতে নিয়ে চলেন! উপন্যাসের স্মার্ট-ইন্টেলেকচুয়াল ফূর্তির বদলে ছবিটাতে মনের নানান জটিলতায় বোনা একটা মিউজিকাল সিম্ফনি চলতে থাকে—বাগানে 'মেমরি গেম'-এর সিকোয়েন্স-এ যা ঝমঝম করে বেজে ওঠে। নিজেদের বাসি-রংচটা-এতোলবেতোল জীবন থেকে, ষাটের দশকের একদম শেষে কলকাতার আগুন-রক্ত-বুলেট-বারুদের গন্ধ থেকে, পালাতে চাওয়া যুবকরা ওইখানে একটু-একটু করে ধরা পড়তে থাকে। তাদের অস্বস্তি-টেনশনগুলো, আবার সেই টেনশন লুকোনোর চেষ্টাগুলো, মিলেজুলে ছবির মিউজিকাল গড়নের মধ্যেও আরও একটা প্যাটার্ন খাড়া করে। অসীম আর তার দলবলের বিবস্ত্রীকরণ চলতেই থাকে। তাই ছবির শুরুতে খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে যারা সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিঁড়তে চেয়েছিল—ছবির শেষে তারাই যখন আদিম অরণ্যের দিনরাত্তির থেকে সভ্যতার রুটিন-জীবনে ফিরতে চায়, তখন লজ্জা ঢাকার সুতোটুকুও তাদের শরীরে আছে বলে মনে হয় না।

ছবিতে প্রোটাগনিস্ট যুবকদের শ্রেণিচরিত্র বদলে দেওয়ার একটা কথা সুনীল এখনও বলেন। কিন্তু অসীম-সুদ্ধ ছবির চারজন তো বইয়ের যুবকদের মতোই ভীষণ মধ্যবিত্ত। বিনা টিকিটের বদলে কর্পোরেট চাকরি-সূত্রে সোশ্যাল মবিলিটি-র সিঁড়িতে দু-ধাপ উঠে যাওয়া অসীমের গাড়িতে চেপে জঙ্গল-ভ্রমণে যাওয়ার জন্য তাদের কতটুকু শ্রেণিচ্যুতি ঘটছে? বরং ছবি জুড়ে তাদের মধ্যবিত্ত রকমারি ভড়ংগুলোই তো বারবার সামনে এসেছে! আসলে সুনীলের কাহিনির 'বিদ্রোহী বাউন্ডুলেপনা'-র মধ্যে সেই সময়ের সামাজিক-রাজনীতি থেকে পালিয়ে সরে থাকার যে সেরিব্রাল ছল বা অজুহাত ছিল, সত্যজিতের ছবিতে সেটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটাতেই হয়তো লেখকের কোথাও বাধছিল। অবশ্য সত্যজিৎ রায়, যিনি তাঁর সেরা ছবিগুলোর ৯৫ শতাংশই, কোনও না কোনও 'মেজর', 'মাইনর' ও মাঝারি সাহিত্য থেকে 'অ্যাডাপ্ট' করেছেন, মানে 'অবলম্বন' করেছেন এবং বড়রকমের কিছু রদবদল করেননি, তাঁকে বারবারই লেখকদের অভিমান বা ভক্ত পাঠকদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়েছে। 'অপরাজিত'-র সর্বজয়ার প্রতি অপুর 'নিষ্ঠুর, উদাসীন অবহেলা' নিয়ে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। 'অপুর সংসার'-এ অপর্ণার মৃত্যুর খবর শুনে বাঙালির রোমান্টিক আইকন অপু-র অমন ভায়োলেন্ট প্রতিক্রিয়াও সবার হজম হয়নি।

তবে সবচেয়ে হুজুতিটা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বড়গল্প 'নষ্টনীড়' থেকে 'চারুলতা' করতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথের এই গল্প যা নাকি অনেকটাই আত্মজৈবনিক—যে গল্পের কোণে-কুলুঙ্গিতে-আলসে-বারান্দায়-ছাদে-বাগানে নাকি 'জ্যোতিদাদা'-র স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তমা 'বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে টিনএজ রবি ঠাকুরের গহন-গোপন-বেদনাবিধুর রোমান্সের অনেক রক্তরাগ ছড়িয়ে আছে, সত্যজিৎ নাকি ছবি করতে গিয়ে সেই প্রায়-'স্বর্গীয়' প্রেমের সত্যনাশ করেছেন। 'নষ্টনীড়'-এ দেওর-বউদির কামগন্ধহীন পবিত্র মহব্বতকে 'অ্যাডালট্রি' বানিয়ে ছেড়েছেন।


'ম্যাকবেথ' থেকে বিশাল ভরদ্বাজের 'মকবুল'

সত্যজিতের 'চারু বৌদি' মাঝে-মাঝেই অমল দেওরের দিকে কীরকম 'তীব্র' কামনাময় চোখে তাকাচ্ছিল, তাতে অমলতা যে বিশেষ ছিল না সেটা সমালোচকরা নিশ্চিত বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই, শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান সত্যজিতের এহেন নৈতিক 'বিচ্যুতি' দেখে গর্জে উঠেছিলেন। এমনকী যে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় অবিশ্বাস্য যত্নে ও দুরন্ত বিশ্লেষণী প্রখরতায় দু-খণ্ডে 'চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়' নিয়ে নিবিড় আলোচনা করেছেন, তিনিও খানিকটা লাজুক স্বরে বলেছেন, আর যাই হোক রবীন্দ্রনাথ তো গল্পটি ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী লেখেননি। অমল-চারুলতার প্রেমকে কিছু দূর এগোতে দিলেই ব্যাপারটা যেদিকে গড়াত, সেটা হল দৈহিক সম্পর্ক। 'এটা সম্ভবত তাঁর



(রবীন্দ্রনাথের) সমকালের কারও কাছেই, এমনকী তাঁর কাছেও রুচিপূর্ণ হত না।' গল্পে তাই—রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ঢাকনা খোলামাত্রই—অমলকে বিদায় দিয়েছেন ও চারুর বিরহ-পর্ব শুরু করে দিয়েছেন। প্রেমের ঘোষিত আবেদনপত্র-সুদ্ধ চারুকে অমলের কাছাকাছি ঘেঁষতেই দেননি। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে চারুলতা শুধু প্রেমের গাঢ়তা নিয়ে অমলের দিকে তাকায় না—অমল অন্য নারীকে (চারুর বউদি মন্দা) বেশি পাত্তা দিচ্ছে বলে ঈর্ষায় ছটফট করতে করতে, অমলের ওপর তার পূর্ণ অধিকার বা পজেসিভনেস জাহির করতে করতে, এবং অমলের কাছে পুরোপুরি সমর্পণের তীব্র আকুলতা নিয়ে, তার মুখোমুখি হয়!

সত্যজিৎ তাঁর 'চারুলতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের টেক্সট থেকে বিচ্যুতির সিনেম্যাটিক যুক্তি ও কারণগুলো প্রায় ধরে-ধরে ব্যাখ্যা করেছেন। ফিল্মস্কুলের ছাত্রদের কাছে সাহিত্য থেকে চিত্রনাট্য রচনার জন্য এই প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য। তবে সত্যজিতের তরফে এত সাফাই দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না। তিনি সেলুলয়েডে প্রেম, প্যাশন, বিশ্বাসভঙ্গ ও বিচ্ছেদের যে চিরকালীন ধ্রুপদী আখ্যানটি নির্মাণ করেছেন, সেখানে চরিত্রগুলোকে, তাদের স্বাভাবিক-সহজাত আবেগের মুখে, ব্রাহ্ম পিউরিটান রুচিমাফিক সংযমের ঢাকনা কেন পরিয়ে রাখতে হবে? তিনি তো 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে 'চারুলতা' করছেন। এখানে তো তিনি চারুলতা নামে একটি রক্ত-মাংসের নারীকে, তার নিঃসঙ্গতা, তার অবদমন, স্বামীর সঙ্গে তার শীতল সহবাস, অন্য এক পুরুষের প্রাণময়তায় তার কাঙ্ক্ষিত উষ্ণতা-সন্ধানের

প্রেক্ষিতেই দেখবেন। এই চারুলতাকে কেন অমলের সঙ্গে সাতসমুদ্রের দূরত্বে বসে বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে প্রথম প্রেমের উপলব্ধি পেতে হবে? কেন সে তীব্র প্যাশনে অমলের জামা আঁকড়ে ধরে, তার বুকের কাছে মাথা রেখে, আহত অভিমানে ভেঙে পড়বে না? স্বামীর বিপর্যয়ের দিনেও কেন সে অমলের দু-হাত চেপে ধরে তীব্র উৎকণ্ঠায় বলে উঠবে না—কথা দাও, যাই হোক না কেন, তুমি এখান থেকে যাবে না, কথা দাও? অমল রূঢ়ভাবে তার হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে। প্রাথমিক আকর্ষণের চমক কেটে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথের মূল টেক্সট-এর মতোই, তার মনে হতে পারে, 'সে সহস্র হস্ত গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল'! কিন্তু চারুলতা অমলের কাছে তার প্রেমকে গোপন করতে যাবে কেন? অমল তার দাদা ভূপতির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ না-করার শপথ নিতে পারে, কিন্তু চারু প্রেমহীন, বাসনা-স্থবির একটা সম্পর্কে বিশ্বস্ত থাকতে যাবে কেন? চারুর এই বিশ্বাসভঙ্গ সম্পর্কে বইতে ছিল—'অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।' সিনেমায় এই সমস্ত 'দেখিতে' ও 'ভাবিতে' অনেকটা সময় নষ্ট হত। তাই চারুর এত বছরের বঞ্চনা-অবহেলার প্রত্যাঘাতটুকু ভূপতিকে ফিরিয়ে দিতে, তার কাছে তখনও সজীব-সবুজ সংসারের ছবিটাকে এক মুহূর্তে 'বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ' করে দিতে—সত্যজিৎ একটিমাত্র শট-ই ব্যবহার করেছেন।

বিলেত থেকে আসা অমলের চিঠি মুঠোয় নিয়ে ভূপতি-চারুর শোওয়ার খাটে উপুড় হয়ে চারুর আকুল কান্না—তুমি কেন চলে গেলে ঠাকুরপো—এই একটা দৃশ্যই চারু-ভূপতির নষ্ট দাম্পত্যকে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার সুযোগটুকুও দেয় না। গল্পের শেষ দু'টি সংলাপ ও ছবির শেষ দৃশ্যের বিখ্যাত ফ্রিজ শটটি তাই শেষ অবধি একই জায়গায় এসে দাঁড়ায়। গল্পে 'ভূপতি কহিল—চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো। চারু বলিল, না, থাক।' ছবিতে বাইরে-থেকে-ফিরে-আসা ভূপতিকে ঘরে নেওয়ার জন্য চারু দ্বিধাগ্রস্ত হাতটা বাড়ায়, দরজার ওদিকে ভূপতি সেই বাড়ানো হাতটা ধরতে চেয়েও থমকে যায়। দু'জনের সেই একটু কিন্তু অনন্ত দূরত্বের ফ্রিজ শটের ওপরেই ফুটে ওঠে একটি শব্দ—'নষ্টনীড়'!

রবীন্দ্রনাথকে সত্যজিতের এই যে সেলুলয়েড-রূপান্তর বা রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে এই যে সত্যজিৎ-সৃষ্টি, এখানে কোথাও তেমন বিদ্রোহ বা রবীন্দ্রনাথকে ভেঙে-চুরে নেওয়ার চেষ্টা, অথবা রবীন্দ্রনাথ চুলোয় যান, আমার 'চারুলতা' চলবে আমার ভাবনায়—এরকম কোনও ডিরেক্টরিয়াল স্বেচ্ছাচার—কিছু ছিল না। এমনকী রবীন্দ্রনাথকে সিনেমার প্রয়োজনে 'সংশোধন' করার নমুনাও বিশেষ নেই। তবুও যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁকে ঘিরে বাঙালির একটা নৈতিক নেকুপনা বা সামাজিক পিসিমাপনার বাড়াবাড়ি থাকবেই। রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা যেন মূর্তিমতী আদিখ্যেতা—তাদের ইচ্ছে-মোহ-বাসনা-খিদে, সব নাকি বুকের ভেতর পাথরচাপা থাকবে! পাতার পর পাতা 'সলিলকি'-তে তার দুয়েক ছটা আভাস থাকবে! কিন্তু অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমের কেউ যদি বিটুইন দা লাইনস সেই মেয়ের মন পড়তে চান, তখনই রবীন্দ্রনাথের সাড়ে সর্বনাশ হয়ে গেল বলে রব ওঠে। 'চোখের বালি'-তে বিনোদিনী-কে নিজের মতো করে 'পাঠ' করতে গিয়ে বাঙালি নাগরিক এলিটের (অন্তত তখনও অবধি) আর এক পছন্দের পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকেও বেশ বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছিল। এমনিতেই বাঙালি ঘরের বিধবা হিসেবে বিনোদিনীকে নিয়ে সমাজপতিদের বেশ একটু অস্বস্তি ছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে বেরতে শুরু করার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের ওপর চাপ তৈরি করা হতে থাকে। বিধবা বিনোদিনী দিয়ে লেখক বড্ড বাড়াবাড়ি করাচ্ছেন, এর পর ঘরে-ঘরে বাঙালি কুলীন বিধবারা বিনোদিনীকেই রোল-মডেল করে সমাজবিপ্লবে নেমে পড়বে, অনেকটা এই ধরনের অভিযোগও ওঠে। ফলে বিনোদিনীকে আগেভাগেই বাঙালি বিধবার শেষ ভরসা কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পরিস্থিতি সামলাতে হয়। এই যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের শেষটা নিজের পছন্দমতো করতে পারেননি—এই জায়গাটা থেকেই ঋতুপর্ণ 'চোখের বালি'-র জন্য একটা অন্য এন্ডিং ভাবতে থাকেন।

মজার ব্যাপার হল ঋতুপর্ণ যে ছবিটা উপন্যাসের মতো করে শেষ করলেন না, তাই নিয়ে কিন্তু ততটা হইচই হয়নি। কোলাহল যা কিছু সেটা ছবিতে যৌনতার বাড়াবাড়ি নিয়ে। যে ছবির নায়িকা বিধবা, সহ-নায়িকা অনভিজ্ঞ-আনাড়ি এক সদ্য-বিবাহিতা, যে কিনা স্বামীর উপহার দেওয়া নতুন পোশাকটুকুও নিজে পরতে পারে না, সহ-নায়ক এক সংযমী জাতীয়তাবাদী পুরুষ—সেখানে এত শরীরী প্যাশন আসে কী করে? ছবির ইংরেজি নাম 'প্যাশন প্লে' বলেই কি তাতে অমন গনগনে প্যাশন ঢেলে রাখতে হবে? বিধবা যুবতী ছবির দুই পুরুষকে পালা করে সিডিউস করছে—রাতদুপুরে পরপুরুষকে ঘরে নিচ্ছে—তার অলংকার আতিশয্য গলায়, কাঁধে, পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আবার বনভোজনে গিয়ে আরেক পুরুষের উন্মুক্ত শরীরে পেশি আর পৌরুষের ঢেউ দেখে দৃশ্যতই মুগ্ধ ও উত্তেজিত হচ্ছে—এতসব শরীরীপনা রবীন্দ্রকাহিনির অন্দরে দেখে বাঙালি দর্শক শিউরে উঠেছিল। 'চোখের বালি'-র কাহিনিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহার করে, ঋতুপর্ণ 'গুরুদেব'-কেও প্রায় পর্নোগ্রাফি-র লেখক বানিয়ে দিলেন, এরকম অভিযোগও উঠেছিল।

অথচ বিনোদিনীর রূপযৌবনের টানে মহেন্দ্রর ভেসে যাওয়ার কথা কিন্তু উপন্যাসেই ছিল। এখন পুরুষ যে নারীর টানে ভেসে যাচ্ছে, হাতের মুঠোর ক্ষমতা ও অধিকার জাহির করার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সেই নারীর শরীর আঁকড়ে ধরবে না—সেটা হয়? 'প্যাশন প্লে' তো একদিক থেকে পাওয়ার গেম-ও বটে! সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্ত শক্তিতে বলীয়ান মহেন্দ্রকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সবদিক থেকেই দুর্বল, তারই অন্নে আশ্রিতা বিনোদিনীরও তো শরীরটাই একমাত্র অস্ত্র ছিল। 'প্যাশন প্লে' তো সেখানে শরীরের খেলা হবেই! বিনোদিনীকেও তো সেখানে শরীরিণী, এমনকী গেরস্ত মূল্যবোধ-মাফিক স্বৈরিণী হতেই হবে। বরং বিনোদিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য ঐশ্বর্য রাইকে নির্বাচিত করে ঋতুপর্ণ ছবিতে প্যাশন-এর মাত্রা কিছুটা কমিয়েই এনেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ পশ্চিমী সৌন্দর্যচর্চায় চর্চিত সুতনুকা ঐশ্বর্যের মডেল-শরীরে, উপন্যাস জুড়ে ছেয়ে থাকা বিনোদিনীর যৌবনের সেই আলো-আঁধারের খেলা যেন সবটা ধরা পড়ছিল না। তাই উপন্যাসে ছড়িয়ে থাকা অজস্র প্যাশন-বারুদ পর্দায় যেন সেইভাবে শরীরী-বিস্ফোরণ ঘটাতে পারল না। 'চোখের বালি' ছবিতে শরীর এত বেশি কেন-র বদলে বরং প্রশ্ন তোলা যায় শরীর আরও বেশি নয় কেন?

হয়তো দর্শক ও রবীন্দ্র-উপাসকদের আরও বেশি 'কালচারাল শক' থেকে বাঁচাতেই ঋতুপর্ণ দুঃসাহসী হতে চেয়েও হননি। তবে একুশ শতকের চলচ্চিত্রকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে 'অবলম্বন' করতে গেলে যে গুরুভক্তিতে একেবারে গদগদ হয়ে থাকলে চলবে না, ঋতুপর্ণর 'চোখের বালি' অন্তত সেই স্পর্ধাটা দেখিয়েছিল! আসলে রবীন্দ্র-সৃষ্টি নিয়ে বাঙালি এমন টেনশনে টানটান হয়ে বসে থাকে যে, তাদের মনের বন্দরে বানানো সাহিত্য স্মৃতি-সৌধে নিরীক্ষার হাতুড়ির এক ঘা পড়লেই, চারদিকের বিপদ-ঘণ্টি ঢং ঢং করে বেজে ওঠে। অথচ শেক্সপিয়র নিয়ে ইউরোপে-হলিউডে কতদিন ধরেই কতরকম ভাঙাভাঙির পরীক্ষা চলেছে। একদিকে লরেন্স অলিভিয়ের, অনার্স ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চের গভীর মনোযোগী ভাল ছাত্রের মতো অতি সন্তর্পণে ও ভক্তিভরে পর্দায় শেক্সপিয়র পাঠ করেছেন। কোথাও এতটুকু অ-শেক্সপিয়রীয় কিছু ঘটতে দেননি। এবং চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসেবে নিদারুণ ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে আবার অরসন ওয়েল্স-এর মতো হলিউডের চিরকালের সৃষ্টিছাড়া 'ব্যাড বয়'-ও



'অরণ্যের দিনরাত্রি' সুনীলের যুবকেরা সত্যজিতে অন্যরকম

আছেন—যিনি বরাবর স্টুডিও-প্রথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দড়ির ওপর বিপজ্জনক ভাবে হেঁটেছেন! দর্শককে কাছে টানার চেয়ে, ভাগানোর ব্যাপারেই বেশি ব্যস্ত থেকেছেন। এহেন অরসন ওয়েল্‌স যখন শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' বা 'ওথেলো' নিয়ে ছবি করার কথা ভাববেন, তখন যে তিনি লরেন্স অলিভিয়েরের মতো বাধ্য, ভাল ছাত্র হবেন না—বরং শেক্সপিয়রের প্রযোজনার ইঙ্গ-মার্কিন ট্র্যাডিশনকেই পায়ে পায়ে রামধাক্কা মারবেন সেটা বলাই বাহুল্য।

এমনিতে শেক্সপিয়র-বিশেষজ্ঞরা বলেন, আধুনিক নাট্যকারদের তুলনায় শেক্সপিয়রের নাটক অনেক বেশি 'সিনেম্যাটিক'। প্রায় শট ডিভিশন করার মতোই তিনি ছোট-ছোট দৃশ্যে অনেক বড়-ছড়ানো ঘটনা ও সময়কে চমৎকার গুছিয়ে বেঁধে দিতেন। গোটা নাটকটাকে প্রায় চিত্রনাট্যের মতো করেই ফাঁদতেন। কিন্তু অরসন ওয়েল্‌স ওইসব শেক্সপিয়র ডিসিপ্লিনের ধার ধারেননি। 'ওথেলো' করতে গিয়ে তিনি শেক্সপিয়রকে কেটেছেঁটে একশা করেন। তাঁর ছবি শুরুই হয়েছিল 'ওথেলো' আর ডেসডিমোনার শেষকৃত্যের দৃশ্য দিয়ে। সেখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে তিনি ন্যারেটিভ-এ ঢুকছেন। আর সেখানেও তিনি চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী। ইয়াগো-র বিখ্যাত সব সলিলকি, সাহিত্যের ছাত্ররা যেসব সংলাপের জন্য কান পেতে থাকেন, ওয়েল্‌স সেসব কেটে উড়িয়ে দিলেন। এমন একটা সাউন্ড ডিজাইন করলেন, যেখানে সংলাপ ভাল করে শোনাই যায় না। আসল ভাষাশিল্পী শেক্সপিয়রকে ছাঁটাই করে ওয়েল্‌স তাঁর কল্পনার হিস্টিরিয়া-র অনন্ত আকাশে ভিস্যুয়ালের ডানা মেলতে চেয়েছিলেন। একটার পর একটা অনন্য কাব্যময় সংলাপের ইট গেঁথে তৈরি করা শেক্সপিয়রের ভাষাপ্রসাদের গরাদ ভেঙে, আকাদেমিক চর্চার কুয়াশা সরিয়ে 'সেক্স-কবি'-কে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সেট-ডিজাইন, লোকেশন বাছাই, কস্টিউম ডিজাইন-সহ ভিস্যুয়াল ট্রিটমেন্ট-এ চমকে দিয়েও অরসন ওয়েল্‌সের শেক্সপিয়র-চর্চা হয়তো সিনেমা হিসেবে পুরোটা উতরোয় নি। তবুও সেলুলয়েডে শেক্সপিয়র নিয়ে নিরীক্ষার শুরুটা তাঁর হাতেই। পরে সোভিয়েত পরিচালক গ্রিগরি কোজিনৎসেভ-এর 'হ্যামলেট' বা 'কিং লিয়র' একেবারে অন্যরকম একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে শেক্সপিয়রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। অন্যদিকে কুরোসাওয়া-র 'থ্রোন অফ ব্লাড', ম্যাকবেথ-কে জাপানি উপকথার টেক্সট-এ পাল্টে নিয়ে ক্ষমতার রাজনীতির একটা অন্যরকম ভাষ্য তৈরি করে। উত্তর-আধুনিক হলিউডেও বাজ লুহরমানদের মতো পরিচালকরা 'রোমিও-জুলিয়েট'-এর মূল আখ্যানটাকে প্রায় সংলাপ-সুদ্ধ নিটোল রেখে, শুধু সময় আর পটভূমিটাকে পাল্টে দিয়ে, অদ্ভুত একটা ভিস্যুয়াল মজা নিয়ে আসেন, কিন্তু সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কেউ কপাল চাপড়ে বলেন না, রোমিওকে জিন্‌স পরিয়ে শেক্সপিয়রকে পরম অবমাননা করা হয়েছে।

মিডিয়া-বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহান অনেক দিন আগে বলেছিলেন, সমস্ত নতুন শিল্পমাধ্যমের গায়েই তার জন্মচিহ্ন হিসেবে পুরনো মাধ্যমটির ছোঁয়া লেগে থাকবেই, তাই সিনেমা যতই স্বাধীন হোক সাহিত্যের অবলম্বন পুরোটা খসিয়ে ফেলতে পারবে না। ফলে 'অবলম্বনে' নিয়ে একটা টানাপোড়েন, ইগো-র ঠোকাঠুকি থেকেই যাবে। সাহিত্য-অনুরাগীরা বিচ্যুতির অভিযোগ তুলবেনই। সিনেমাওয়ালারাও বলবেন, সাহিত্যে তো দু-লাইনে দু'শো বছরে কথা বলে দেওয়া যায়, ভিস্যুয়াল মাধ্যমের কথা বলার ভঙ্গিটা অন্যরকম। এইসব তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে কোনও এক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস নিয়ে গৌতম ঘোষের ছবি 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র রিভিউ লিখতে লিখতেই, তাঁর চির-ফিচলে ভঙ্গিতেই একটা অমোঘ মন্তব্য ছুড়ে দেবেন। কমলকুমারের উপন্যাসের প্রথম প্যারাগ্রাফের শুরুতে ছিল, 'আলো ক্রমে আসিতেছে'। ওই প্যারাগ্রাফেরই শেষ লাইনটা ছিল 'ক্রমে আলো আসিতেছে'। সন্দীপন লিখেছেন, 'আলো ক্রমে আসিতেছে' ছবির ভাষায় ধরা যায়—গৌতম ধরতে পেরেছেন। কিন্তু 'ক্রমে আলো আসিতেছে'-র অভিঘাত সিনেমার ভাষাতে ধরাই যায় না। গৌতমও পারেননি। আলটপকা ভীষণ স্মার্ট মন্তব্য করাটা ভদ্রলোকের অভ্যেস ছিল। এটাও হয়তো সেরকমই কিছু। কিন্তু তারপরেও তো তিনি সাহিত্যিকদের তরফে সিনেমার দিকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে গিয়েছেন। সিনেমাওয়ালারা নেবেন কি?

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

বালক বয়সে মতিমাস্টার সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'ছাড়পত্র' বইটি হাতে ধরিয়ে বলেছিলেন, 'মন দিয়ে পড়বি। দেখবি, মুখস্থ হয়ে যাবে।' সেই বয়সে কবিতাগুলো পড়ে চনমনে হয়ে উঠেছিলাম। শিশুর বাসযোগ্য করতে পৃথিবীর সব জঞ্জাল সরাবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। আর একটু বড় হতেই হাতে এল গোর্কি-র 'মাদার'। আমি তখন শোষিতের কাঁধে কাঁধ দিয়ে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। কলেজে যেতে না যেতে 'দাস ক্যাপিট্যাল' পড়ে ফেললাম। এবং এর পরিণতিতে ছাত্র ফেডারেশন-এর সমর্থক না হয়ে কোনও উপায় ছিল না। ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিলে পা মেলাচ্ছি। চিৎকার করে বলছি, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

তখন বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেস আমল। এক-একজন কংগ্রেস নেতা ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে জমিদারের ভঙ্গিতে রাজনীতি করছেন। আশু ঘোষ কম্বল কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন অথবা গনিখান চৌধুরী বিয়ার খেয়েছেন বলে খবরের কাগজ মুখর যতটা না হয়েছে, বিরোধী দল তার অনেকগুণ বেশি চেঁচিয়েছে। জ্যোতি বসু বক্তৃতা দেবেন শুনলে লোকে ছুটে যেত। ভদ্রলোক বেশ গুছিয়ে কংগ্রেসকে আড়ংধোলাই দিতে পারেন।

কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙল। সিপিআই-তে যত বিদ্বজ্জনের ভিড়। শিক্ষিত লেখক এবং সাংস্কৃতিক জগতের বামপন্থী তন্তুরা সিপিআই-তে নাম লেখালেন। জ্যোতি বসু কিছুদিন দোনামনা করে যখন দেখলেন সিপিআইএম-এ ভিড় কম, শুধু প্রমোদ দাশগুপ্ত আর হরেকৃষ্ণ কোঙার—তখন তিনি সিপিআইএম-এ যোগ দিলেন। চিন ভারত-আক্রমণ করল কিন্তু সিপিআইএম বলল ওটা সীমান্ত সংঘর্ষ। আমার এক বন্ধু কবিতা লিখলেন, 'আলোক দেখায় বন্ধু স্তালিন চীনের চৌএনলাই।' তখনই ধন্দ লাগল। সিপিআই যেন রাশিয়ার মুখপত্র আর সিপিএম চিনের। এরা কেউ ভারতবর্ষের কথা বলছে না। একদিন তিরিশের বি বাসে ভিড়ের মধ্যে রড ধরে দাঁড়িয়েছি, দমদম স্টেশনে যাব, মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার মতো দাঁড়িয়ে আছেন। অত বড় কবি, যিনি লিখতে পারেন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত', তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতো বাসে ঝুলে যাচ্ছেন, বড় আনন্দ হল। পরিচয় থাকার কথা নয়। আগ বাড়িয়ে কথা বললাম, 'আপনি এদিকে থাকেন?' তিনি মাথা নাড়লেন, 'না ভাই, একটু মস্কো যাচ্ছি।'

চমকে উঠলাম। লোকে বিদেশে যাওয়ার জন্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছয় ট্যাক্সি বা গাড়িতে। কবি যাচ্ছে পাবলিক বাসে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার জিনিসপত্র?'

'সব ওখানেই রাখা আছে।' হেসেছিলেন তিনি। অর্থাৎ মস্কো যাওয়াটা তাঁর কাছে বর্ধমান যাওয়ার মতো স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

সিপিআই-এর কথা থাক। সিপিএম-এর চিনা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের কিছু তাত্ত্বিক প্রথমে নিচু গলায়, পরে সোচ্চারে বললেন, 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।' যেন ভারতবর্ষ কোনও স্বাধীন রাষ্ট্র নয়, চিনের অঙ্গরাজ্য। ততদিনে 'রেড বুক' পড়ে ফেলেছি। মাও সে তুং-কে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি, কিন্তু তাঁকে আমাদের চেয়ারম্যান বলে মনে করার কোনও যুক্তি পাইনি। এইসময়েও সিপিএমের ভূমিকা কেমন মিনমিনে ছিল। বাড়ির রোজগার না-থাকা মেজভাই-এর মতো। সাতষট্টি-র নির্বাচনে নিজের মুখ রক্ষা করতে তাই যুক্তফ্রন্ট গড়তে হল তাদের, অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস-কে মাথার ওপর বসিয়ে। আর এই ঘটনাই আমাকে বুঝিয়ে দিল, এতদিন যা পড়েছ তা এদেশের মাটিতে সম্ভব নয়।

সেই নির্বাচনের ঠিক আগে কেউ ভাবতেই পারেননি কংগ্রেসের পতন হবে। খবরের কাগজও আগাম জানান দিতে পারেনি। আমাদের জলপাইগুড়ির এমএলএ এবং দীর্ঘকালের মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্তমশাই এক জনসভায় ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'কেউ কেউ বলেন স্বাধীনতার পরে এতকাল ক্ষমতায় থেকে আমরা ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে গিয়েছি। তাই যদি হয় তা হলে আমাদের পেট ভর্তি, গলা অবধি খাবার। আর খাওয়ার ক্ষমতা নেই যখন, তখন নির্বাচিত হওয়ার পর আপনাদের জন্যে কাজ করব। আর ওই যারা ফ্রন্ট করেছে তারা এতকাল খেতে না পাওয়ায় শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে আছে। একবার ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে এমন গপগপিয়ে খাবে যে আপনারা কণাটুকুও পাতে পাবেন না।'

স্বপ্ন তো একবারে ভঙ্গ হয় না। দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসা স্বপ্ন চোখ থেকে দূর হতে সময় নেয়। যুক্তফ্রন্ট এল এবং গেল। বামফ্রন্ট এল এবং নকশাল আন্দোলন শুরু হল। জ্যোতি বসু ময়দানে ঘোষণা করলেন তিনি একদিনে নকশাল আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে পারেন। নকশালরা বুর্জোয়া নয়, শোষক নয়। তাদের আন্দোলন তখন বিপক্ষে চলছে। সেই আন্দোলনকে গণবিমুখ করতে কংগ্রেস, সিপিএম সমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নকশালদের মধ্যে কংসালরা ঢুকে পড়েছে। ততদিনে বুঝে গিয়েছি, মিছিলে পা মিলিয়ে আমি এক পা-ও এগোতে পারিনি।

সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সেই কলঙ্কিত রাজত্ব, জরুরি শাসনব্যবস্থার পর সিপিএমের নেতৃত্বে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল তখনও স্বপ্নটা লেগেছিল চোখের পাতায়। তারপর দীর্ঘকাল ধরে আক্ষেপ আর আক্ষেপ। আমার ভাবতে অবাক লাগে, মার্কসবাদে আস্থাশীল একটা দল বত্রিশ-তেত্রিশ বছর ধরে সর্বময় ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলা বা শহর অথবা গ্রাম দূরের কথা, একটা ছোট রাস্তার দু'পাশে বাস করা মানুষদের একত্রিত করতে পারল না? তাঁদের রাজনৈতিক চেতনাকে স্বচ্ছ করতে পারল না? বত্রিশ-তেত্রিশ বছর ধরে স্লোগান, অবরোধ, হরতাল, ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে? জেলা শহরের (গ্রামের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না) হাসপাতালগুলোতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন এরা এমন স্তরে যে মানুষ সেখানে চিকিৎসার আশা করে না। হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার যন্ত্রগুলো বছরের পর বছর খারাপ করে রাখা হয় যাতে ডাক্তারের বাড়ির যন্ত্র থেকে রোগীরা রিপোর্ট নিয়ে আসতে পারে মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে।

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ মানে সংঘবদ্ধ হুঙ্কার শুনতে হবে। গ্রামে যারা সিপিএম করে তাদের সম্পত্তিতে অবশ্যই মোটরবাইক থাকবে, জমিজমা-টাকা তো বটেই এবং তাদের চোখরাঙানি যারা সহ্য করবে না তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। কমিউনিস্টরা চেয়েছিল শোষিতের পাশে দাঁড়াতে। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর নিরাপদে ক্ষমতা ভোগ করতে করতে তারাই হয়ে গেল নব্যশোষক।

এর সঙ্গে গত কয়েক বছরে যুক্ত হল অহংকার আর ঔদ্ধত্য। বিনয় কোঙার থেকে অনিল বসু কথা বললেই ঔদ্ধত্যের উদাহরণ তৈরি করেন। পচা আলুর পাশে পড়ে থাকলে অন্য আলুও নষ্ট হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও গত কয়েক বছরে ব্যঙ্গ করতে রপ্ত হলেন। যা কিছু তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটবে তাকেই নস্যাৎ করছেন তিনি। অথচ এই মানুষটি দলের কাজকর্মে হতাশ হয়ে কয়েক বছর আগে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যে-দল রবীন্দ্রনাথকে একদা বাতিল করেছিল, যাদের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান বাজানো অপরাধ ছিল, সেই দলের মুখ্যমন্ত্রী অবলীলায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন,



ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন দক্ষতার সঙ্গে। অথচ তাঁকেও ওইসব সভায় গিয়ে গণসংগীতের নামে একধরনের গান, যা দেশের মানুষ গ্রহণ করেনি—তা গাইতে হয়। এখনও নিজেদের কমিউনিস্ট প্রমাণ করতে পতাকা বা কোনও মৃতজনকে শ্রদ্ধা জানাতে হাত মুঠো করে বিশেষ ভঙ্গিতে ছুড়তে হয়। কেন? একসময় ওঁরা গ্রামাঞ্চলে, মফস্বল শহরে যে ভাষায় বক্তৃতা দিতেন তার অনেকটাই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত না। কার উদ্যোগে জানা নেই, চেহারা বদলাল। এখন শুধু রবীন্দ্রনাথের গান নয়, সুবীর সেনের আধুনিক গান, 'ওই উজ্জ্বল দিন', ওঁদের অনুষ্ঠানে বাজছে।

মানুষ এখন তিতিবিরক্ত। রোজ যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুলো কিনতে হয় তার দাম এখন নাগালের বাইরে। এই শীতকালে শাকসবজির দাম কমে যেত, এত বছর ধরে তাই দেখেছি। এ বছর ঠিক উল্টোটা ঘটছে। আলু-পেঁয়াজ আগে যাঁরা এক কেজি কিনতেন এখন সেই টাকায় দুই-আড়াইশো গ্রাম কিনতে হচ্ছে। ডাল তো ছোঁয়াই যাচ্ছে না। মাছ, এমনকী তেলাপিয়াও, যে এতকাল ব্রাত্য ছিল, সে একশো-র ওপরে চলে গিয়েছে। বাজারে ঢুকে আমি ভাবি মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে? অথচ পাশাপাশি ফিল্ম ফেস্টিভাল, নাট্য-উৎসব, উচ্চাঙ্গ সংগীতের কয়েক রাতের অনুষ্ঠান দেখার জন্যে লাইন পড়ছে। এখন কলকাতায় ঝাঁ চকচকে মলের সংখ্যা কত? সেখানেও তো ভিড় প্রচুর। শুধু লক্ষপতিরাই সেইসব মলে যাচ্ছেন না। সাধারণ মানুষও উঁকি মারছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে তিন হাজার টাকায় মালয়েশিয়া যাওয়া আসার টিকিট যে-সব মধ্যবিত্ত কিনেছেন তাঁদের সংখ্যা শুনলে চমকে যেতে হবে। শনি-রবিবারে কলকাতা এবং সল্টলেকের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে মোটা দামের টিকিট কিনে ঢোকার জন্যে লাইন দিচ্ছেন কারা? দেখলেই বোঝা যাবে তাঁরা নেহাতই মধ্যবিত্ত। এঁরা টাকা পাচ্ছেন কোথায়? যাঁরা চাকরিজীবী তাঁদের মাইনে তো বাড়েনি। সেই মাইনেতে তো মাছ-মাংস ডাল ভাতের দাম সামলানো যাচ্ছে না। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচও আকাশচুম্বী। তা হলে?

এক বন্ধু বললেন, 'এই কারণে বাজারে গিয়ে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হলেও তারা দল বেঁধে প্রতিবাদ করছে না। আজ পর্যন্ত তুমি একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না যেখান মানুষ কোনও বাজারে জিনিসের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।' রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষণা করে, 'পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, রাজ্যের ওপর কেন্দ্রের অবিচারের প্রতিবাদে, খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে', তখন তার সঙ্গে জুড়ে দেয়, 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে অমুক সভায় দলে দলে যোগ দিন।' একপয়সা বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতায় আগুন জ্বলেছিল। পাঁচ টাকার আলু কুড়ি টাকায় বিক্রি হলে কোনও হেলদোল নেই!

তাই মানুষ চাইছে নতুন সরকার। মুশকিল হল শুধু বামফ্রন্ট-বিরোধী কথা বললে যে সাময়িক সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে তা কতদিন ধোপে টিকবে? ক্ষমতা হাতে পেলে তার উপযুক্ত ব্যবহার দক্ষ হাতে করার জন্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মানুষকে আগাম জানাতে হবে। নইলে মানুষ ভয় পাবে, এখন ফুটন্ত তেলে ভাজাভাজি হচ্ছি, ভবিষ্যতে জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়ব না তো!

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

১ম অধ্যায় ব্রজবুলি

চার নম্বরের দালানটা ক্রমশ ভরে যাচ্ছে। হলুদে ছোপানো লালপাড় শাড়ি পরা বউরা একটার পর একটা ঢুকছে। ঢুকছে তো ঢুকছেই, বাব্বা কত! পাশের বাড়ির জেঠিমা বলে উঠলেন—বেশ তত্ত্ব! নজর আছে!

সামনের বাড়ির কাকিমা বললেন—রাজার তত্ত্ব! এখন যদি ডাক্তারবাবুকেও এরকম করতে হয় তা হলেই তো হয়েছে।

জেঠিমা বললেন—তা কেন সবিতা, যার সাধ্য তার তার! তাছাড়া ঠাকুরপো মানী মেজাজি লোক, কারও সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মানুষ নয়।

সবগুলো বউয়ের হাতে পেল্লাই ট্রে আর থালা। জরি-সিল্কের ঝকমকানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। পমদিদির গায়ে-হলুদের তত্ত্ব আসছে তো আসছেই।

বুবু, পুনপুন, বুনবুন দৌড়োদৌড়ি করে একবার একতলা একবার দোতলা করছিল।

বুনবুন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এল—বুবু দেখবি আয় কীরকম দৈত্যদের সিঙাড়া-কচুরি এসেছে! দৈত্যদের মিষ্টি, আমাদের জলখাবারের রেকাবির মতো চন্দ্রপুলি, চৌকো কুশন—বালিশের মতো চিত্রকূট। সন্দেশ দিয়ে সাহেব-মেম করেছে আবার, ঠিক যেন সত্যি। মাথায় আবার লজেন্সের ছাতা, লাল নীল হলদে সবুজ...। তার চোখ বিস্ময়ে গোল হয়ে থাকে।

পুনপুন খুবই বিজ্ঞের মতো বলে—বিয়েতে এরকমই হয়। মানিকের মেজদিমণির বিয়েতেও এসেছিল।

বুনবুন ছুটে ওপরে চলে গেল, তারপরই নীচে নেমে এল—মে'দের কত জামাকাপড় রে? পমপম দিদি একা এই সমস্ত পরবে? কখন পরবে?

বুবু গম্ভীর চালে বলে—যখন রিসাচ করতে যাবে তখন।

—তখন তো পমপম দিদি সাদা কাপড় আর কমলালেবু ব্লাউজ পরে। এখন থেকে তা হলে বেনারসি পরে যাবে?—পুনপুন ভেবলে যায়।

—বিয়ে হয়ে গেলে তাই তো পরে। বুবু উবাচ, কত্ত গয়না পরে দেখিস না! চুড়ি বালা সব ঝমঝম করবে।

পমদিদির এই বেনারসি পরা ভবিষ্যৎ কেন কে জানে পুনপুন-বুনবুনের একেবারেই পছন্দ হয় না। এক বিনুনি করা বা হাত খোঁপা করা সাদা শাড়ির যে পমপমদিদিকে তারা ভালবাসে, ভয় করে, সারদা মায়ের মতো সুন্দর দেখে, এই সব নীল-লাল জর্জেট শাড়ি আর গা-ভরা চুড়ি-বালা পরলে সেই পমদিদিকে কেমন দেখাবে তাদের মাথায় আসে না। চিনতেই পারছে না, একদম অন্য মে' বলে মনে হচ্ছে। পমদিদি, তুমি অত চুড়ি হার, লাল-সবুজ পরো না, তোমাকে ভাল দেখাবে না, একদম ভাল দেখাবে না।

বুবুর কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভাল লাগছে। সে পাকা গিন্নির মতো শাড়ি উল্টেপাল্টে দেখছে। কাকিমা-জেঠিমারা যেমন বলছেন, সেও তেমন তেমন সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছে—এইটা তাঁতের, এটা সিল্কের, এটা জর্জেট কাপড়, সে মার্কাগুলোও পড়ছে। গুড়ি মেরে মেরে এগোচ্ছে ট্রেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সব মিলিয়ে নিতে হবে না? প্রজাপতি-আঁকা কার্ড ধরে একবার মিলিয়ে নিয়েছেন বড়রা, তাতে কী হল? দু'বার করে মেলাতে হয়, জানো না বুঝি? নীচের দালানে যখন পুনপুন-বুনবুন মুখে একমুখ জল নিয়ে দৈত্যদের সিঙাড়া-কচুরি দেখছে, তখন বুবু শাড়িগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে, নামগুলো জেনে নেয় ভাল করে। আঙুলের কর গোনে সে। এই দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়, করে করে ষোলো বছর বয়সে তার নিশ্চয় বিয়ে হয়ে যাবে। কেননা, সে পমদিদি টমদিদির মতো কলেজে-টলেজে পড়তে পারবে না। ঢুকতেই দেবে না তাকে। পাশ করলেই তো হবে না! আবার ফার্স্ট হতে হবে, তবে কলেজে ঢুকতে দেয়। তাই কোনওরকমে স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তার মা-বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেবেন, পিসিমা বলেছেন। আর তখন এই সব লাল-নীল-হলুদ-সবুজ জরি-ঝকঝকে, রেশম-চকচকে এক আলমারি শাড়ি তার হবে। তার একার। জর্জেট শাড়ি পরে, ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে, মুক্তোর মালা পরে সে মামার বাড়ি-টাড়ি যাবে। দিদিভাইয়ের সঙ্গে গল্প করবে হাত নেড়ে নেড়ে পিঁড়িতে বসে, রান্নাঘরে কিংবা খাবার ঘরে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যার এত শাড়ি গয়না, সিঙাড়া-কচুরি, চটি-জুতো, সেই পমদিদিরই কেমন মুখ ভার। ব্যাপারটা বুবু স্বভাবতই দুই ভাইয়ের দৃষ্টিগোচরে আনে। তাতে বুনবুন বলে বিয়েতে মে'দের মুখ কাঁদো-কাঁদোই হয়, বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে কি না! মা-বাবা, ভাই-বোন পিসিমা দিদিভাই কানুমামুফুলদের ছেড়ে অন্যদের বাড়ি যেতে হওয়াটা বিচ্ছিরি! পুনপুন প্রতিবাদ করে—মানিকের মেজদিমণি তো খুব হাসছিল! চারটে কলাগাছের মাঝখানে পিঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ফিকফিক, ভাঙতে ভাঙতে খিলখিল করে, এমনকী যখন বিয়ে হয়ে গাঁটছড়া বেঁধে জামাইবাবুর সঙ্গে বাসরে যাচ্ছিল, তখনও মেজদিমণির সারা মুখ হাসিতে আলো হয়েছিল। এই পর্যন্তই সে দেখেছিল, এরপরই সিং বাড়ির বিখ্যাত আতসবাজি পোড়ানো শুরু হয়ে যায় তাই চুম্বকের টানে লোহার টুকরোর মতো সে মাঝ-উঠোনে চলে যায়, এবং সেখান থেকে একসময়ে তার বাবা পিছন থেকে ঠিক শেয়ালের খরগোশ ধরার মতো তাকে ক্যাক করে ধরে বাড়ি নিয়ে যান। তিনজনেই আবছা ভাবে বুঝতে পারে মানিকের মেজদিমণিদের সঙ্গে পমদিদিদের কোথাও একটা মৌলিক ফারাক আছে। তাই কেউ ফিকফিক হাসে তো কেউ গোমড়ামুখে থাকে। তবে বুবু কিছুতেই ভেবে পায় না এত গয়না-শাড়ি, এত ঘটাপটার পরও কী করে পমদিদি গম্ভীরমুখে থাকে। মোটেই কাঁদো-কাঁদো



নয়! গম্ভীর। এটাই যদি তাদের বাড়ির প্রথা হয় তা হলে তাকে এখন থেকেই অভ্যেস করতে হবে। এমন মুখ করে থাকা যেন তত্ত্বের জিনিসপত্রগুলো তোমার নয়, তোমাকে সবাই খাতির করছে না, বিয়েটাও খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মুখ গম্ভীর করে থাকতে হবে। সে পেরে উঠবে কি না তাই ভাবে।

নীচের দালানে সার সার খেতে বসেছে গায়ে-হলুদওয়ালিরা। হলুদ শাড়ি, লাল পাড়, সব একরকম। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! বড় বড় রুই মাছের দাগা পড়ছে পাতে পাতে। টপটপ করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঘোমটার আড়ালে। বড় বড় লেডিকেনি শাঁৎ শাঁৎ। সে একটা দেখবার জিনিস!

—ভাল করে খাও মা—দিদিভাই নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছেন।

ঘিয়ে ভাজা লেডিকেনির গন্ধ আসছে ছাতের ম্যারাপ থেকে। ওখানে গদি গেড়ে বসে আছেন বড়মামু।

—এত লেডিকেনির লোক হবে তো রে? নীলকণ্ঠ? হবে তো?

—তা কী করে বলল মামাবাবু। আমাকে তিনশো লোকের মাল করতে বলা হয়েচে, আমি চারশো লোকের করেচি। ঘরযোগেও তো খাওয়া হবে। তা আপনি একটু টেস করে দেখুন না!

—দেখিস বাবু, গুচ্ছের রসশুদ্ধু দিস না। একটু ঠান্ডা করে দে। গরম রসে টাকরা পুড়ে গেলে আর তোর মাছের প্যাটিস কেতে পারব না।

লেডিকেনি টেস করতে করতে মামাবাবুর খেয়াল হয়—হ্যাঁরে নীলকণ্ঠ, খাসির মাংস আছে তো রে?

—কী যে বলেন মামাবাবু, মেয়ের বিয়েতে কখনও মাংস হয়?

—কেন হয় না বল দিকি? দু-চারটে খাসি মারলে কিছু খাসি বংশ নির্ব্বংশ হয়ে যাচ্ছে না। শুভদিনের কথাই যদি ধরিস তো দুগ্গাপুজো কালীপুজো কি শুভদিন নয়। তা'লে? ছ্যাডাং ছ্যাডাং করে ছাগবলি হচ্ছে না সেখানে? যত দোষ করল মেয়ের বিয়ে?

—আসল কথাটা কী হল বলেন দিকি মামাবাবু! নীলকণ্ঠ ঠাকুর এবার বিশদ হয়—মেয়েকে তো বলির পাঁটার মতোই কেঁপতে কেঁপতে শউরবাড়ি পাটানো? তাই পাঁটা-খাসি কাটতে মেয়ের বাপের মন সরে নে।

—বলিস কী রে! তত্ত্বের ছব্বা দেকেচিস? তত্ত্ব দেখলেই আদর টের পাওয়া যায়। জড়োয়ার গয়না পজ্জন্ত এয়েচে।

—তা হবে—নীলকণ্ঠ ঝাঁঝরি করে লেডিকেনি গুলোকে ঘিয়ের মধ্যে খেলায়। আরশুলোর মতো গায়ের রং ধরবে, তবে না লেডিকেনি! তার এখন জড়োয়ার গয়নার গপ্পো করার সময় নেই। মামাবাবু এবার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় ল্যান্ড করেন।

—আমার বিয়েতে তো স্রেফ শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে পার করলে।

গরিবের মেয়েই বলো আর বড়লোকের মেয়েই বলো বরেরও তো কিছু পাওনা-গণ্ডা থাকে! তা সে সব যাক গে। মা কিন্তু দেখে শুনে দামি বেনারসি, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, ধনেখালি, শান্তিপুরি কাপড় সব দিয়েছিল। মানেটা কী দাঁড়াল বলো তো?

নীলকণ্ঠ জবাব দেয় না। ওদিকে তার জোগাড়ে সন্দেশটা কীরকম মাখল এখন দেখতে হবে। লোহার কড়ায় ফেলে তাড়ু দিয়ে নাড়তে নাড়তে দানা দানা হওয়া চাই। পেস্তা, কিশমিশ কুচনোটাই বা কেমন হল!

—মানেটা হল শ্বশুরবাড়িতে বউয়ের আদর বাঁধা। বড়মামু মন্তব্যটি কোরে, লেডিকেনিতে দ্বিতীয় কামড় দিলেন।

বড় বড় শালপাতার থালায় এখন আধখানা সিঙাড়া, সিকিখানা নিমকি, চিত্রকূটের একের তিন এ সব পড়েছে। বুবু, পুনপুন, বুনবুন, মামুফুল, আরও কিছু কিছু ছোট বড় ছেলেমেয়ে খাচ্ছে। দেবহূতি সব ভাগযোগ করছেন। সব আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীকে গায়-হলুদের খাবারদাবার ভাগ করে দিতে হয়। নিজেরা সব পেট্টায় করে দিলেই হল?

বুবু বলল—শালপাতা কোত্থেকে আসে বলত?

পুনপুন নিশ্চিন্তে উত্তর দিল—চ্যাঙারি থেকে।

বুনবুন বলল—কোথা থেকে আবার! বাজার থেকে!

—তোদের মাথা! মামুফুল গাঁট্টা মারল বুনবুনের মাথায়—শালপাতা আসে শালগাছ থেকে ঠিক যেমন কলাপাতা আসে কলাগাছ থেকে। কবে যে বুদ্ধি হবে!

—কিন্তু কলাপাতা তো সবুজ, শালপাতা যে শুকনো খড়মড়ে?—পুনপুন ছোট্ট গলায় একটু প্রতিবাদ জানায়।

বুবুর চোখ ভেসে যায়। হঠাৎ সে সামনে দেখতে পায় অদ্ভুত এক শুকনো পাতার বন। অনেক গাছ সেখানে, ঝুপড়ি ঝাপড়, তাতে বড় বড় পাতা হয়, কিন্তু সব শুকনো, শুকনো খড়মড়ে। কী অদ্ভুত! এরকম বন কোথায় থাকে? সে কি কোনওদিন দেখতে পাবে? ভেবে সারা হয়ে যেতে থাকে বুবু। আর ঠিক সেই সময়ে বড়মামু আবির্ভূত হয়ে বলেন—দিদি, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

—কীসের কথা বলছিস? দিদি বলেন।

—এই ধরো একেকখানা যজ্ঞিবাড়িতে যেকালে পাঁচ হাজার শালপাতা খরচা হচ্ছে বিয়ে পইতে ভাত শ্রাদ্ধের সিজনে যদি পাঁচ হাজার যজ্ঞিবাড়িও হয়, তা হলে হল গিয়ে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ মানে ধরো গিয়ে পঁচিশ লাখ...সেকালে তো ইন্ডিয়ার শালবন কয়েক বছরেই সাফ! বিয়ে থা তো আর খালি শহরেই হচ্ছে না। ব্যাপারটা ভাল। সিরিয়াস ফান্ডামেন্টালি। ভাবো দিদি ভাবো।

মামিমা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি সামলাতে লাগলেন।

দিদিভাই বললেন—যা দিকিনি এখান থেকে! কীসের তদারকি করছিলি করগে না গিয়ে!

দেবহূতি বললেন—তুই মিছে ভাবছিস ভানু। পাতা নিলে তো আবার পাতা গজায়। গাছ যতদিন আছে, শীত বসন্ত যতদিন আছে, ততদিন পাতা ঝরবে, পাতা গজাবে।

—তাই বলো, এতক্ষণে দিদি একটা লজিক বললে। সত্যি বলছি কথাটা আমার মনে হয়নি। এইটুকু বললেই তো হয়! অত হাসির কী আছে।—তারপরেই আপনমনে বললেন সি টু এ টন! অ্যাটিটিউড!

মামিমার দিকে আড়চোখে চাইলেন মামু। অনেক কষ্টে বাকি হাসিটা সামলাচ্ছেন মামিমা। বুনবুন দেখল মামিমার মুখটা টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে।

পমপমদিদিকে কিন্তু কিছুতেই লাল শাড়ি পরানো যায়নি। সাদার ওপর লাল জরির পাড়, ভেতরে জরির বুটি দেওয়া জরি-সিল্কের শাড়ি পরে পমপমদিদির সারদা-মাতৃত্ব একটুও ক্ষুণ্ণ হল না দেখে দুই ভাই বড় খুশি। কিন্তু যেই সোনার চুড়ির ওপর কাঁকন, গলার সরু মটরমালার ওপর জড়োয়ার সীতাহার পরানো হল, কানে ঝুমকো দুল, আর কপালে চন্দন, পমপমদিদিকে কোন সুদূরের দুঃখিনী রাজকন্যার মতো দেখাতে লাগল। দুই ভাই দু-লাফে সেখান থেকে হাওয়া। এখন থেকে পমদিদি আর তাদের চিরপরিচিত পমদিদি নেই, সে রূপকথার রাজকন্যা হয়ে গিয়েছে। চিরদিনের জন্যে। তাদের আর কোনওদিন চোখ পাকিয়ে বকবে না, পড়া দেখিয়ে দেবে না, চুল ফিরিয়ে আঁচড়ে দেবে না। কেমন একটা গা ছমছমে মতো লাগে বিয়েবাড়ি। বুবু যখন বলে—দেখেছিস, পমদিদিকে কীরকম অন্যরকম লাগছে!

তখন পুনপুন বলে—ভাল লাগছে না।

বুনবুন বলে—বাজে লাগছে।

—কী ভাল লাগছে না? বাজে কেন?—বুবু অবাক হয়ে বলে, এই ট্রান্সফর্মেশন তার মনে নানা আশা জাগাচ্ছে। সে-ও ওরকম সীতেহার পরে অন্যরকম হয়ে যাবে, একলাফে একেবারে রাজকন্যে।

—ও অন্য লোক হয়ে গিয়েছে, আমাদের পমপমদিদি নয়, পুনপুন বলে, তার বুক হু হু করছে। বুনবুন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে পুনপুনের সঙ্গে একমত। তবে তার যেটা হচ্ছে, সেটা মনকেমন নয়, কেমন একটা রাগ।

—বিয়ের জল গায়ে পড়লে ওরমই হয়, বুবু বলল, বিয়ের জল গায়ে পড়ার ব্যাপারটা তার লেটেস্ট সংগ্রহ, আজকে অন্তত সাত আটবার শুনেছে কথাটা। কেমন নতুন নতুন, বেশ লাগসই কথাটা, সুযোগ পেয়েই ব্যবহার করে নিল বেশ। আর তার পাকামিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তার দুই ভাই। কত কী জানে বুবু, বাব্বাঃ!

পরক্ষণেই দু-ভাইয়ের দুশ্চিন্তার কারণ ধরতে পেরে বুবু সান্ত্বনা দেয়—দেখিস, বিয়ে হয়ে গেলে আবার যখন খড়কে ডুরে শাড়ি পরে আসবে, তখন আর অন্য লোক মনে হবে না।

সন্ধে হতে না হতেই টমদিদি ওদের টেনেহিঁচড়ে ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেয়, পুনপুন-বুনবুনের ধুতি-পাঞ্জাবি লাভ হয়েছে। গোলাপি সিল্কের পাঞ্জাবি পরে দু-ভাইকে খাসা দেখাচ্ছে। বুবুর সাদা ধবধবে লেসের ফ্রক, ঠিক যেন পরি। তিনজনেই আড়ে আড়ে আয়নার দিকে চায়।

বর এসে যায়। কী হইহই, রাজপুত্তুরের মতো নাকি, সবাই বলে। জামাইবাবু, জামাইবাবু, তোদের জামাইবাবু সবাই বলছে আর হাসছে। খুব শাঁখ বাজতে থাকে, মা বরণ করেন, কারা যেন বিশ্রী লু লু লু লু করে। বরযাত্রীরা ঘিরে দাঁড়ায়। মেয়েরা কী সব হাসি ঠাট্টা করে, আর মশাল নিয়ে ঘুরতে থাকে, পাশের বাড়ির পাকাচুল জেঠিমা পর্যন্ত লাল টুকটুক বেনারসি শাড়ি পরেছেন, অথচ মা সেই সাদা মতো শাড়ি, বুবুর খুব ইচ্ছে মা-ও লাল বেনারসি পরেন, কিন্তু বলতে কি আর সাহস হয়? ব্যস তারপরেই ঘুরপাক দিয়ে বিয়ে হয়ে যায়। আর এতক্ষণে পমদিদির কাঠের পুতুলের মতো চলাফেরা দেখে, আর জামাইবাবুর ভীষণ ফরসা মুখ, ঢেউ ঢেউ চুল দেখে যেমন পুনপুন-বুনবুন তেমন বুবুরও পরান উড়ে যেতে থাকে। মুখ শুকনোর কী আছে কেউ জানে না, কিন্তু মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যায় একেবারে।

এই সময়ে একজন বরযাত্রী ডাকে—এই খোকা, এই খুকু শুনে যাও। তোমরা কে? বেশ মজাদার তো? যমজ, নয়?

পুনপুন মুখ উঁচু করে জবাব দেয়—আমরা পমদিদির ভাইবোন।

—পম? কনের ডাকনাম বুঝি পম?—খুব হাসাহাসি শুরু হয়। এর মধ্যে হাসির কী আছে? পমদিদির নাম তো পমই হবে! কী বোকা, কী বোকা!

লোকগুলো আবার তিন বার করে পান চায়। প্রথমবার ওরা নিয়ে আসে। তারপরে আর আনে না, যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে চলে যায়। কেন না তিনজনেই বুঝতে পারে এই যাত্রীগুলো পান চেয়ে চেয়ে ওদের খ্যাপাচ্ছে। খাওয়ার আগে



কেউ আবার পান খায় না কি? ওরা এখন যথেষ্ট চালাক, বোকা বানানো অত সোজা নয়।

জামাইবাবুর বাবার আবার বিরাট গোঁফ। কোত্থেকে যেন রটে গেল উনি কুস্তিগীর। অমনি ওদের হাসি পেয়ে যায়। কারুর বাবা ডাক্তার হতে পারেন, প্রফেসর হতে পারেন, রেলের কাজ, সরকারি কাজ...কতরকম আছে। কিন্তু কুস্তি...? তিনজনে মুখ লুকিয়ে হাসে। গামা পহ্‌লবান, গোবরবাবু, গুন্ডা!

একজন যাত্রী বলে...কী খোকা-খুকু অত হাসছ কেন?

—আমরা হাসিনি তো!

পুনপুনটা সবচেয়ে বোকা, বলে ফেলে...কুস্তির জন্যে।

—কুস্তি? কুস্তি কোথায়? যাচ্চলে!

আর একজন বললে—তুই তখন থেকে ওদের পেছনে লেগে আছিস কেন বল তো সুকুমার? ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা হাসছে, ছোট বাচ্চা! তা ছাড়া পেছনে লাগবার মতো অনেক আছে এ বাড়িতে। পরের বোনটাকে দেখেছিস?

পুনপুন সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল—টমদিদি। টমটম।

—টমটম গাড়ি না টমটমদিদি, খোকা?

পুনপুন এবার ঠাট্টাটা বোঝে। সে নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বিখ্যাত মাছের প্যাটিস খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক বিয়েবাড়িতে তারা গিয়েছে, কিন্তু তখন বেগুন ভাজা আর কুমড়োর ছক্কা খেলেই পেট ভরে যেত। এখন বুদ্ধি হয়েছে। বুবু উপদেশ দেয় বেগুনভাজা তো রোজ রোজ বাড়িতেই হয়, কুমড়ো তো খেতে বিশ্রী, নীলকণ্ঠদাদা কিশমিশ আর ছোলা দিয়েছে, তাই মাছের প্যাটিসটা খা, আর লেডিকেনি। নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথা বলে ওরা, যাতে কেউ শুনতে না পায়।

—ও খোকা, তোমার টমটম দিদির ভাল নামটা কী?

—ভক্তি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বুবুর টিপুনি খেয়েও পুনপুন বলে ফ্যালে।

—ভক্তি? সত্যি ভক্তি! রংখানা দেখেছিস?

—পরের বোনটাও লাভলি। অত ফরসা নয়।

দিদিদের প্রশংসায় তিন ভাইবোনই বেশ বিগলিত। বুবুই এবার বলে—স্মৃতি।

—আর ডাকনাম?

—পুটপুটদিদি।

—কেন? খুব পিটপিট করে বুঝি?

আবার ঠাট্টা বুঝতে পেরে তিনজন হেলায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চিংড়িমাছে মনোনিবেশ করে। যাত্রীগুলোকে তাদের একদম ভাল লাগছে না।

আরও খারাপ লাগার কারণ ঘটে যখন খাওয়াদাওয়ার পর একেকজন দশটা কুড়িটা লেডেকেনি সাঁটিয়ে, পেটে হাত বুলোতে বুলোতে সেই ঘরটয়ায় গিয়ে ঢোকে যার নাম বাসরঘর। পমদিদি আর জামাইবাবুর পিছনে লাল সাটিনের তাকিয়া আর সাদা ফরাসের ওপর এক গুচ্ছের মেয়ে। সব বন্ধু পমপমদিদির, টমদিদিরও। এই মেয়েদের দঙ্গলে হুমহাম করে ঢুকে যায় যাত্রীগুলো।

—হে হে, হি হি, পম বউদি একটুখানি মুখ তুলে অধমদের দিকেও তাকান। ক'খানা ফটো অন্তত তুলি জোড়ের!

পম বউদি শুনেই পমদিদি ঝট করে মুখ তুলেছিল। তখনই বুবুরা শিঁটিয়ে গিয়েছে। পমদিদি টের পেল বলে। তারপর এই বিয়েবাড়িতেই না তিনজনের কান কষ কষ করে মুলে দেয়।

—দেখিস রথীন, রসগোল্লা আজকেই টপাস করে ফেলিস না। একটু ধৈর্য ধরিস।

রসগোল্লা? রসগোল্লা কোথায়? জামাইবাবু আর পমদিদির সামনে একখানা থালায় সন্দেশ, ক্ষীর এইসব। রসগোল্লার খোঁজে তিনজন উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। তাদের যদিও পেটে আর জায়গা ছিল না, তবু রসগোল্লা হবে অথচ তাদের দেওয়া হবে না এতে তাদের মহা আপত্তি। এ নিশ্চয়ই মায়ের কীর্তি। সব সময়ে কিছু কিছু ভাল জিনিস তাদের দিতে বারণ করে দেবেন।

হঠাৎ পমদিদির মুখটা কীরকম জ্বলে উঠল, সে জামাইবাবুর দিকে চেয়ে কী যেন বলল। যাত্রীগুলো ইতিমধ্যে আরও অনেক কথা বলে ফেলেছে, ছবি তুলেছে, জমিয়ে বসার তাল করছে। রথীন জামাইবাবু হাসতে হাসতে বললেন—বাজে ফক্কুড়ি করিস না, ওর ভাল লাগছে না।

আর ঠিক এই সময়েই বুবুকে কে পেছন থেকে টান দিল। পুনপুনের কান কার আঙুল।

—এখানে কী করছ? এটা কি ছোটদের জায়গা?—টমদিদি রাগত স্বরে বলে উঠল। টমদিদির হ্যাঁচকায় তিনজোড়া অনিচ্ছুক পা উৎসব থেকে নিয়মের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মায়ের ঘরের নিরিবিলিতে তাদের বিলি ব্যবস্থা করে টমদিদি বলে—ঘুমিয়ে পড়ো, আমি একটু আসছি, ঘর থেকে এক পা বেরবে না। কোনটা ছোটদের জায়গা কোনটা বড়দের জায়গা এ দু'দিন ওরা একদম বুঝতে পারেনি। ছাতে ভিয়েন হচ্ছে, ঘি আর মিষ্টির গন্ধে ভুরভুর চারদিক, গেলেই বড়মামু বললেন—এটা কি ছোটদের জায়গা? যাও যাও।

বাবা অমনি বলবেন—যে-ই তৈরি হয়ে যাবে, আগে তোমাদের দেবে, বুঝেছ নীলকণ্ঠ!

ছিঃ, তারা যেন হ্যাংলা, খাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

গনগন করে জ্বলছে দু'টো উনুন, তাতে কীরকম কলবল কলবল করে ডাকছে ঘি, ময়দার মতো করে ছানা ঠাসছে একজন, আরেকজন এলাচদানা পুরে ছোট ছোট লেচি কাটছে। সন্দেশের ওপর রুপোর তবক লাগানোর মতো ম্যাজিক জিনিস তো ওরা এই প্রথম দেখল! দেখতে ইচ্ছে করে না? এ একটা উৎসবও বটে, ম্যাজিকও বটে। তাড়া খেল। কী? না ওটা বড়দের জায়গা। পমদিদির গায়ে যখন হলুদ লাগানো হচ্ছিল তখনও তাদের দূর দূর করা হয়েছিল। মায়েরা যেখানে বড় বড় বঁটি পেতে ঘ্যাঁসঘ্যাঁস করে কুটনো কুটছেন, সেখানে যেতেই পাশের বাড়ির জ্যাঠাইমা বলে উঠলেন—বঁটি কাত করো, বঁটি কাত করো! একটা অনর্থ না হয়! এদের পেছন পেছন এখন তো সব দস্যিগুলো আসবে!

পিসিমা অমনি তাড়া দিয়ে ওঠেন—এখানে কী করছিস? যা যা, এখানে কি ছোটদের আসতে আছে?

তা হলে ছোটরা কোথায় যাবে?

মানিকদের বাড়ি যেমন অনেক লোকজন, অনেক বাচ্চা, অনেক হইহুল্লোড়, কে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় লুকোচ্ছে, হুইসল বাজিয়ে মার্চ করছে, দেখার কেউ নেই। কেউ এমনি করে তাড়া দেয় না। সিংঘি বাড়িতে তা হাওয়ার জো নেই। কানুমামুফুল ওদিকে দিব্যি পুটপুটদিদি, অং দাদা আর ওদের সব বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। বড় না হলেও কেমন বড় বড়। বুবু পুনপুন, বুনবুনের তেমন কোনও বন্ধু নেই। পাড়ার বন্ধুরা আসবে সেই রাতে। পুনপুনের অবশ্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, মানিক। কিন্তু মানিকের এখনই বাবা মা বোনেদের সঙ্গে, মামার বাড়ির দলের সঙ্গে পাহাড়ে যাওয়ার দরকার পড়ল।

কথা বলতে থাকে তিনজনে ফিসফিসিয়ে। ঘরে এখন কেউ নেই। মায়ের আলনায় গুচ্ছের শাড়ি ছাড়া রয়েছে। পাট পর্যন্ত করা নেই। এখানে-ওখানে খালি কুচো ফুল আর শালপাতা বিছানার ওপর পাউডার কুমকুম, সব সাজের জিনিস এখনও ছড়ানো। তাদের মধ্যে তখন এইমতো কথা হয়।

বুনবুন—আচ্ছা বুবু, মে'রা বড় হয়ে গেলেই কি তাদের বিয়ে হয়ে যায়?

পুনপুন—হয়ই তো! যে-ই পাশ করবে, খাতা বই ব্যাগ নিয়ে লাইব্রেরিতে যাবে, অমনি বিয়ে হয়ে যাবে।

বুবু—(ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে) অত পাশ না করলেও মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। মানিকের মেজদিমণি তো কিছুই পাশ করেনি, তা-ও তো হল!

এটা অবশ্য, বুবু নিজের পথ পরিষ্কার রাখার জন্য বলল। উকিলি ভাষায় এটা একটা নজির।

বুনবুন—তুইও তো বিচ্ছিরি মে' একটা। তোরও তো বিয়ে হয়ে যাবে তা হলে!

বুবু—(গর্বের সুরে)—যাবেই তো!

পুনপুন—তুই কেন শুধুশুধু মেয়ে হতে গেলি? আমরা কেমন ক্রিকেট খেলতুম ব্যাডমিন্টন খেলতুম।

বুবু—সে হবে না। আমারও গায়ে হলুদ দেবে, তত্ত্ব আসবে, ঝকমকে শাড়ি গয়না পরব, গালে চন্দন পরব, তারপরে তো ময়দা মাখতে হবে, কুটনো কুটতে হবে, রান্না করতে হবে, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে হবে। গুচ্ছের কাজ। তারপর সে খুব গুপ্ত কথা বলার মতো করে বলল—সিনেমা দেখতে যাব।

—অ্যাঁ! দু-ভাই একসঙ্গে বলে ওঠে। তারা সিনেমা দেখেছে—টারজান আর সাধক রামপ্রসাদ। আরও কত সিনেমা আসে, তাদের যাওয়ার অনুমতি হয় না। সেই সিনেমার দুয়ার অদূর ভবিষ্যতে বুবুর সামনে খুলে যাচ্ছে শুদ্ধু এই বিচ্ছিরি বিয়ের দৌলতে! অনেক কষ্টে হিংসে গিলে নিয়ে ওরা বলে—আমাদের নিবি তো?

ভেবেচিন্তে বুবু উত্তর দেয়—পমদিদিকে জিগ্যেস করতে হবে।

(ক্রমশ)

ছবি ঈলীনা বণিক

সংশোধনী

'অষ্টমগর্ভ' উপন্যাসের সূচনায় শুভারম্ভ-এর পূর্বে 'চতুর্থ স্কন্ধ' শব্দবন্ধটি সম্পাদকীয় অনবধানতায় অনুল্লিখিত রয়ে গিয়েছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

চিত্রলেখা চৌধুরী

প্রাচীনার নবীনবেলার কাহন

আমাদের দোতলার শোওয়ার ঘরের খাটটা ছিল পেল্লায়। ঘোরানো ঘোরানো ছত্রি দেওয়া চারধারে। তার ওপরে চালি। রাতের বেলা সেটা হত মশারির ছাদ, দিনের বেলা সেটা আবার মশারির তাক—চারধার থেকে গুটিয়ে মশারিটা খাটের মাথায় তুলে রাখা।

আর মাঝে মাঝে মশারিটা যখন নোংরা হত, কেচে শুকোতে দেওয়া হত ছাদে। দুপুরের রোদে সাদা-স্বচ্ছ পর্দার মতো ফুলে ফুলে উঠত। ছোড়দি বলত, নৌকোর পাল। পিছনের আকাশে মেঘেরা ভেসে যেত। মনে হত যেন নৌকো চলছে ধীরে—মনপবনের নাও।

মেঘগুলোও যেন মেঘ নয়। কেউ বা ভালুক, কেউ আফ্রিকার ম্যাপ, আবার কোনওটা যেন ম্লানমুখী রবিঠাকুর।

সেই রাত্তির জুড়ে বিছানায় রোদের গন্ধ ম ম করত। ভয় হত, ঘুম ভেঙে যদি চোখ মেলি মাঝরাতে, মশারিটা যেন চারপাশ থেকে বিকেলের রোদ ছড়াবে। আর আমার খেলতে যেতে ইচ্ছে করবে।

আমার শোওয়ার ঘরের খাটটা মা'র বিয়ের খাট। কিন্তু জ্ঞানত মনে পড়ে, তাতে ঘুমোতাম আমরা দু'বোন আর মা। বাবা আর দাদা অন্য ঘরে ঘুমোত—পাশেই। ঘরের লাগোয়া বারান্দার ওপাশটাতে। মা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে কথা বলত। কখনও জোরে জোরে, কখনও আস্তে। আমরা জানতাম ওটা একটা ধরন—অনেকেই করে। একটু নাড়িয়ে দিলেই আবার চুপ করে যেত। জেঠিমা তো ছিল আবার এককাঠি বাড়া। ঘুমের মধ্যে খাট থেকে নেমে বারান্দা দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে যেত। দরজা, চৌকাঠ, দেওয়ালে বা জানলার শার্সিতে ধাক্কা না লাগিয়ে। মাঝে মাঝে খারাপ লাগত। সব ছেড়ে আমাদের বাড়িতেই কেন?

ঠাকুমাকে জিগ্যেস করলে, মিটিমিটি হাসত। তারপর বলত, চুপ কর মুখপুড়ি। বড় হলে বুঝবি। অসুখটার নাকি একটা ভারি ইংরিজি নামও আছে—সমন্যামবুলিজ্‌ম। মানে হচ্ছে, 'ঘুমিয়ে হাঁটা'। অ্যাম্বুলেট মানে বোধহয় হাঁটা—যেখান থেকে প্যারাম্বুলেটর। ঠেলে হাঁটানো। আবার, Somon কথাটার সঙ্গে ঘুমের একটা সম্পর্ক আছে। যে কারণে অনিদ্রাকে ইনসমনিয়া বলে। এগুলো আমাদের বুঝিয়েছিল মণিদিদি। মণিদিদি আমার জ্যাঠার মেয়ে। বাড়ির সব ভাইবোনদের মধ্যে বড়। ফরসা রং। একমাথা চুল। সব সময় পরীক্ষায় ফার্স্ট বা সেকেন্ড হয়। নিয়ম করে বিজয়ার পরদিন একশো আটবার দুর্গানাম লেখে। আমাদের মতো বিরাশি পার করেই 'হয়ে গেছে, হয়ে গেছে' বলে চেঁচায় না। সরস্বতী পুজোর আগে হাজার সাধলেও একটা কুল মুখে তোলে না। এদিকে কিন্তু খেলতে বসলেই—সে লুডোই হোক আর বাঘবিত্তি-ই হোক—নির্ঘাত মিথ্যে বলে আমাদের আউট করে দিত। ওর যত চোট্টামি, আমাদের সঙ্গে। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে চোট্টামি করার সাহস নেই। ভিতুর ডিম কোথাকার। সেদিন রাতেও ঘুম ভাঙল হঠাৎ। মশারি থেকে চুঁইয়ে পড়ছে দুপুরের গন্ধ। যেন সবে বিকেল হবে। কানে এল, মা কথা বলছে। আজ জোরে নয়, ফিসফিস করে। মা'কে জাগিয়ে দেব বলে একটু ঘাড় ঘুরিয়েছি। হঠাৎ দেখি—বাবা। আমাদের খাটে বাবা? কেন বাবা বাবার ঘরে ঘুমোয়নি? আর আমি আর বোন ঘুমোচ্ছি বলে খাটে বোধহয় আর জায়গাও নেই। বাবা গিয়ে মা'র ওপরটাতে শুয়েছে। ফিসফাস কথা বলছে মা। আমি অবাক হয়ে দেখলাম। তারপর মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। জোর করে চোখ বন্ধ করে রেখে আপ্রাণ প্রার্থনা করতে লাগলাম মশারির কাছে, ভুল করে যেন আবার বিকেল না করে দেয় এখন। চোখ বন্ধ করে থাকতে থাকতে ওই প্রথম বুঝে গেলাম, মা-বাবার খেলার সময় বিকেল হতে নেই। এখন আরও আঁধার দরকার। গভীর, গাঢ় আঁধার।



আগের বারের 'গোসাঁইবাগান' যখন তারাপদ রায়কে নিয়ে লিখছি, তখন আমাদের যে রান্না করে, অলু, সে এল আমার চা আর ওষুধ নিয়ে। ওষুধ খেয়ে গেলাস ফেরত দিচ্ছি, দেখি অলু আমার টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ অবাক। সে বলে, 'দিন আনি দিন খাই'? এটা কী বই? আমি বলি, কবিতার বই। কী লিখেছে এতে? আমাদের কথা কিছু লিখেছে? ওকে বললাম, পরে বলব তোমাকে।

অলুর বাড়ি কোথায় জিগ্যেস করলে বলবে, সুন্দরবন অঞ্চল। গ্রামের নাম পিচাখালি। বাড়ির বাবা-ভাই-দাদা সবজি চাষ, ধান চাষ করে। গ্রামের ইস্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল অলু। তারপর বিয়ে হয়ে যায়। তিনটি ছেলেমেয়েকে বাপের বাড়ি রেখে সে এখন আমাদের সর্বক্ষণ সাহায্য করে। আর যখনই ফাঁক পায় বাংলা কাগজ তো পড়েই, বইও তুলে ধরে চোখের সামনে। জানতে চাই, আচ্ছা এই কথাটা শুনে তোমার এত ভাল লাগল কেন? দিন আনি দিন খাই! সে বলে, এ তো আমাদের গাঁয়ে সবাই বলে। আমাদের চেনা কথা। আর আমাদের ওখানে তো সবাই দিন আনে দিন খায়। তাই দেখলাম, বইয়েও লেখা আছে কথাটা।

পরদিন লেখাটা জমা দিয়েছি রোববার-এর দপ্তরে। সঙ্গে তারাপদ রায়ের দু'টো বইও। একজন বলল, 'জলের মতো কবিতা'! বাঃ কী সুন্দর নাম। আপনার কাজ হয়ে গেলে একটু দেবেন কখনও জয়দা, পড়ে দেখব! আমি বললাম, নিয়ে যাও, আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। এই মেয়েটি ইংরেজি নিয়ে পড়েছে। এখন ফিল্ম জার্নালিজম আর অ্যাক্টরদের সাক্ষাৎকার, মডেল বা ডিজাইনারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা—এই নিয়ে কর্মজীবনে ব্যস্ত থাকে। বইটা হাতে নিয়ে সে পাতা ওল্টাতে থাকে, আমি ঘরের অন্যদিকে গিয়ে আমার কাজে বসি। ফিরে এসে দেখি, সে নেই আর। আমি ভাবি, কী এমন জাদু! বাড়িতে রান্নার কাজ করা মেয়ে, আর ফিল্ম জার্নালিজম করা মেয়ে, এদের বয়স কাছাকাছি হলেও জীবন তো সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও তো ছুঁল দু'জনকেই। দু'জনেরই কেন ভাল লাগল! যে ঘর থেকে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছিল, সে, লজ্জিত মেসেজ পাঠাল পরদিন সকালে, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আসা হয়নি। কুণ্ঠার সঙ্গে জানাল, 'জলের মতো কবিতা' বইটার পাতা উল্টেই যে, প্রথম দেখেছিল ১০০১ নামে একটি কবিতা। লেখাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শেষ করে অকস্মাৎ তার চোখে জল এসে যায় এবং সে কাঁধের ব্যাগ তুলে একা রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে থাকে অনেকক্ষণ। আমি তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে : কী জানি, ঠিক এমন কিছু তো কতদিন পড়িনি। হয়তো কোনওদিনই পড়িনি। বোকার মতো কী যে হল আমার!

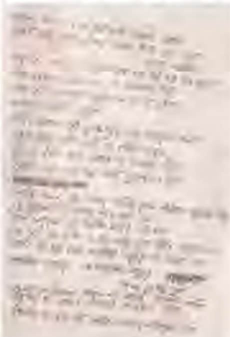
আমি শুধু কবিতার ভিতরে শক্তিটুকু ভাবলাম। কবিতাটা পড়ে হঠাৎ কী যে হল আমার! ওই 'হঠাৎ কী যে হল আমার'-টাই সব! এইবার সেই কবিতা আমি তুলে দিচ্ছি।

১০০১

আমার আর মাত্র এক হাজার একটা কবিতা লেখা বাকি রয়েছে,
তারপরেই এবারের মতো আমার আরব্যরজনী সমাপ্ত।
আর মাত্র এক হাজার এক। খুব হিসেব করে চলতে হবে।
আড়াই বছর আগে বাবা মারা গিয়েছেন, বাবাকে নিয়ে একটা
কবিতা লিখবো। মাকে নিয়ে একটা।
আমার যে পিসিমা, যাঁকে আমি চোখেও দেখিনি, যিনি আমার
জন্মানোর ঢের আগে বাড়ির পিছনের পুকুরে ডুবে মারা
গিয়েছিলেন, যাঁর কোনো একটা ছবি পর্যন্ত আমাদের বাসায়
ছিলো না, যার কথা মনে করে আমার ঠাকুমা সারাজীবন একা
একাই কাঁদতেন, সেই পিসির কথা একটা কবিতায় লিখবো।
একবার একটা সাদাকালো পিঁপিপিপের বাচ্চা পুষেছিলাম, সেটা
কি করে পালিয়ে গিয়েছিলো, অনেকদিন আগের একমুঠো
শুকনো ঘাসসুদ্ধ সেই পিঁপিপিপের তারের জাল দিয়ে তৈরি
খাঁচাটা সিঁড়ির নীচে যেন যেন এখনো রয়ে গেছে। যদি অসম্ভব
না হয় ওই খাঁচাটা নিয়ে একটা কবিতা লিখবো।
আরো দুয়েকটা বিষয় আজকাল আমাকে খুব ভাবায়। 'নিয়তির
পরিহাস ও বন্ধুত্বের পরিণাম' এই রকম লম্বা নামের একটা
কবিতা অনেকদিন হলো ছকে রেখেছি। কিন্তু সেটা লেখা হয়ে
ওঠেনি। চক্ষুলজ্জার বয়েস আর নেই, সময়ও নেই, এবার
কবিতাটা লিখে ফেলতে হবে।
কিন্তু তারপরে?
এর পরেও হাতে থাকছে অন্তত নশোনব্বুইটা কবিতা। সে
সমস্তই তোমাকে নিয়ে। নিতান্ত তোমাকে নিয়ে। শুধুই
তোমাকে নিয়ে লিখে যেতে হবে। লিখতে লিখতে লিখতে
আমি থুরথুরে বুড়ো হয়ে যাবো, হাতের কলম কাঁপবে, কাগজে
কালি চলকিয়ে পড়বে, লিখতে লিখতে লিখতে কব্জি অচল
হয়ে যাবে।
তুমি কি আমাকে ছাড়বে, ছেড়ে দেবে? তোমার ওই
ন'শো নব্বুইটা কবিতা শেষ করার আগে।

হয়তো এই প্রথমবার হচ্ছে যে, গোসাঁইবাগান-এ একটি কবিতা আমি তুলছি, কিন্তু সে-বিষয়ে একটা কথাও বলছি না। বলছি না এইজন্যে যে, কবিতাটা মেয়েটির কথা শুনে, আবার নতুন করে পড়বার পর, আমারও, 'বোকার মতো' সেই 'কী যে একটা' হচ্ছে! আমি জানি, পাঠক আপনারও হচ্ছে। কেননা, এমন একটি প্রেমের কবিতা, বাংলায় লেখা হয়ে লুকিয়ে কোথায় বসে আছে, জানতাম বা জানতাম না। এ কথার মানে কী? জানতাম, আমিই তো জানতাম। 'দেশ'-এর কোনও পুরনো শারদীয়ায় এ লেখা পড়েছি। ভাল বলেছি, অক্লেশে ভুলেও গিয়েছি। ওই মেয়েটির হঠাৎ-আসা-চোখের-জল কবিতাটির পুনর্জন্ম দিল।

লক্ষ করুন, ফর্মের দিক দিয়ে কী আশ্চর্য নতুন এই কবিতা।



এবং কত সাহস লেখকের। একটার পর একটা চরিত্র, আর তার বিবরণ, নিতান্ত যেন সাধারণভাবে বলা। কেন বলছি, এই কারণে যে, এই সাধারণভাবে বলাটাই আসল অসাধারণত্ব। তারাপদ রায়ের অর্জিত অসাধারণত্ব। এই অত্যন্ত সাধারণ বলার ভঙ্গিটাই তিনি দিনে-দিনে আয়ত্ত করে নতুন পথ তৈরি করেছেন বাংলো কবিতায়—যা কেউই তেমন গোচরে আনেনি। কিন্তু এই পথের অনুসরণকারীর সংখ্যা কম নয়। তারাপদ রায়ের কবিতা থেকে আমি টুকরো টুকরো কিছু লাইন বলছি, তাতে বোঝা যাবে, কতটা নিঃসম্বল হওয়ার সাধনা তিনি করেছেন, ফলে কবিতার বাকভঙ্গি হয়ে উঠেছে একেবারে নতুন। 'কৌতূহল' কবিতা থেকে কয়েক লাইন বলি

প্রত্যেক কাহিনির তিনটে দিক আছে।
একটা হল
তাঁদের দিক, তাঁরা কী বলছেন।

একটা হল,
তোমার দিক, তুমি কী বলছ।
আর তৃতীয় দিকটা হল
আসল কথাটা কী,
সত্যি সত্যি কী হয়েছিল।
বলাবাহুল্য,
এই তৃতীয় দিকে প্রক্রিয়ার ব্যাপারটা
তুমিও পছন্দ করো না
তাঁরাও পছন্দ করেন না।

অথবা, আরেকটা কবিতার অংশ দেখা যাক :

...চিয়ার্স!
অন্যের ভালমন্দের খোঁজখবর নিতে নিতে
আমাদের নিজেদের আর কোনও
খোঁজ খবর করার অবকাশ রইল না।
একটা জীবন চলে গেল নিজের যকৃৎ নষ্ট করে
অন্যের স্বাস্থ্য পান করতে করতে।
চিয়ার্স।

এরপর 'কপর্দকশূন্য' নামে একটি কবিতার সূচনা বলছি

কী কুক্ষণে আমি বলে ফেলেছিলাম,
'কপর্দক';
সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ভিখিরি হাত পেতে দাঁড়ালো।
একটু দূরে একজন লোক দাঁড়িয়েছিলো
চেহারার মধ্যে কেমন একটা খাই-খাই, চিরজিজ্ঞাসু ক্ষুধিত ভাব
সে বিনীতভাবে জানতে চাইল, কপর্দক পাইপয়সা কি একই?
তারপর আরও বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো, 'সাহেবরা কি কপর্দককেই
কপার বলে?'
ভিড়ের মধ্যে একজন ছিলেন সোনার বেনে,
তিনি বললেন, 'এই দুর্দিনে তামার পয়সা কোথায় পেলেন?'

কিংবা 'কাপুরুষ' নামে সেই অসামান্য কবিতা, পুরোটাই বলি :

সেই কনফুসিয়স বলেছিলেন
কাপুরুষতার চরম উদাহরণ হল
একজন ভদ্রলোক,
যিনি জানেন
'এটা ঠিক নয়'
কিন্তু কখনও বলবেন না
'এটা ঠিক নয়।'

এই আড়াই হাজার বছরের
প্রাচীন ভদ্রলোকটাই আমি
এই আড়াই হাজার বছরের
প্রাচীন কাপুরুষটাই আমি।

শেষের যে আধ-ভাঙা চার লাইন, এইটি এসেই প্রথম অংশে যা বিবরণ, এমনকী উদ্ধৃতি-প্রায় ছিল, তাকে কবিতায় রূপান্তরিত করল। আড়াই হাজার বছরের সভ্যতা, এই একটি মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে কাপুরুষ গোষ্ঠীর প্রতিভূ হয়ে উঠল। নিজেকে নানাভাবে ঠাট্টা করা, তারাপদ রায়ের একটি প্রিয় খেলা, কবিতায় এই হাজার হাজার বছর ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আসার কথায়, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হয়তো, বিষ্ণু দে'র একটি সনেটে-এর কয়েক লাইন মনে পড়ে গেল

অথচ একটি মেয়ে তুমি শুধু, নিরবধিকাল
বিপুল পৃথ্বীতে ভাবো অগণন কত কোটি মেয়ে
তুমি তারই একজন, তোমার শরীর, মুখ, স্বর,
একার কৃতিত্ব নয়, আপতিক জীবতত্ত্ব বেয়ে
তোমাতে থমকেছে মাত্র, তাও শুধু কয়েক বছর।...

ঠিকই তো! মানুষ ও মানুষীর আয়ু, কয়েক বছরই তো মাত্র! ৫০-৬০-৭০ বা ৮০-১০০। কোটি বছরের তুলনায়, এই কয়েক বছর তো চলতে-চলতে একটু থমকে থাকাই! বিষ্ণু দে-র এই কবিতায় 'জীবতত্ত্ব' কথাটি একেবারে অভ্রান্তভাবেই রয়েছে। 'জীবতত্ত্ব' এখানে থাকলে তারাপদ রায়ের কবিতায় আছে, একরকম 'সমাজতত্ত্ব'-ই। সমাজে, অনেক নিপাট ভদ্রলোক যুগ যুগ ধরে, এইরকম কাপুরুষই হয়ে আসছেন। কবিতাটি অপূর্বতা এইখানে যে লেখক, তাকে নিজের দিকে টেনে আনলেন। কাউকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করলেন না। নিজের ওপরে স্থাপিত করলেন পুরো আড়াই হাজার বছরের ধারাবাহিক এক মনুষ্যস্বভাব। এইভাবেই তিনি লিখেছিলেন, তাঁর 'কম বয়সে যীশুখ্রিষ্ট' নামক কবিতা

আমার চেয়ে কম বয়সে যীশুখ্রীষ্ট
ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন
কিন্তু আমি অপদার্থ, ভীষণ ভীরু
মরতে আমায় দারুণ ভয়!

এখানে বলা দরকার এ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, '৭১ বা '৭২ সালের কোনও পূজাবার্ষিকীতে, সেইসময় সমস্ত কলকাতা জুড়ে নকশাল যুবকদের হত্যা ও পাল্টা হত্যা ঘটে চলেছে। তারই প্রমাণ এ কবিতার শেষদিকের লাইনগুলিতে :

কাঠের মধ্যে পেরেক গাঁথা, কিংবা বোমা পিস্তল চাকু
ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত আমার, আমার শরীর লটকে আছে
ভাবতে গেলে ভীষণ ভয়
ভাবতে গেলে আমার চেয়ে কম বয়সে যীশুখ্রীষ্ট
কিন্তু আমি অপদার্থ...

অর্থাৎ নকশাল আমলে যখন রক্তপাত অস্ত্রব্যবহার চতুর্দিক ছেয়ে ফেলেছে, সেই আঁচ এবং ঝাপট তারাপদ রায় তাঁর কবিতায় গ্রহণ করছেন। কিন্তু কীভাবে। নিজেকে ওই জায়গায় ফেলে দেখছেন। আমি তখন কী করছি? এই পরিস্থিতিতে?

দেয়ালে পিঠ চাদর মুড়ে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ
ঘরের মধ্যে অন্ধকারে দাঁতে দাঁতে
দুঃখে রাগে হায় গা জ্বলে
কিন্তু আমি অপদার্থ, ভীষণ ভীরু।

ওই হত্যা, পাল্টা-হত্যা, সেই নারকীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে অনেকের। প্রতিবাদ না-করা অন্যায় তা বুঝেও মধ্যবিত্ত মানুষ চুপ করে থাকে। যেই নিজের মধ্যে টেনে নিলেন সেই ভীরুস্বভাব, স্বীকারোক্তি করলেন ভীরুতার, সঙ্গে-সঙ্গে এই 'কিন্তু আমি অপদার্থ', এই অপদার্থ আমি কেবল ওই কবিতার লেখককে বোঝাল না। গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের একটা অসহায় দ্বিধা-ভীরুতাকে প্রকাশ করল।

এইখানে তাঁর কবিতায় বড় কবির লক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে। সমস্ত অবস্থার মধ্যে নিজেকে ফেলে-ফেলে তার রিঅ্যাকশন দেখা। দেখে বলা। আসলে, জোর করে নিজেকে নিয়ে যাওয়া নয়। যেমন-যেমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ছি : আমার ভেতরে যে-ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটাকে বলছি। এবং সম্পূর্ণ নিরাভরণভাবে বলছি। এইটাই তারাপদ রায়ের পথ।

এই যে 'আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ভদ্রলোকটিই আমি'—এই আমি-কে এবার আমরা অন্য একটা জায়গা থেকে দেখি। তারাপদ রায়ের নিজেরই একটি গদ্য লেখা থেকে। একটি

অংশ বলছি :

আমি যে জীবনযাপন করি, সে নেহাতই ঘরগৃহস্থী। সে কোনও কবির জীবন নয়। আমি জানি আমার চেহারায়, চরিত্রে, আচার-আচরণে কোথাও এককিন্দু কবিত্ব নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাজারে যাই, খবরের কাগজ একটু পড়ি, ছেলের ইস্কুলের পড়াশোনা দেখি, তারপর অফিস, সেখানে এক ধূলিমলিন জরাজীর্ণ প্রাসাদের অন্ধকার কক্ষে আমার দিন শেষ হয়ে যায়, সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে সংসারের কাছে ফিরে আসি। স্ত্রী-পুত্র, ভাই এবং একাধিক নিম্নবংশজাত সারমেয় নিয়ে আমার সামান্য সংসার, কয়েকজন সুহৃদ, কয়েকজন আত্মীয়।

আমার বিখ্যাত, উজ্জ্বল বন্ধুদের, তাদের বর্ণময় জীবনযাত্রাকে আমি ঈর্ষা করি। কিন্তু আমি এও জানি, আমি চেষ্টা করলেও এখন আর আমার গৃহস্থীয়ানা ছাড়তে পারব না, আমার শেষ নৌকো কবে পোড়ানো হয়ে গিয়েছে।

জীবিকার জন্যে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। গত দু'বছরে এমন অনেক রবিবার ও ছুটির দিন গিয়েছে যখন আমার সময় কেটেছে দূর গ্রামান্তরে মাঠে-মাঠে। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। পরিশ্রমের ব্যঞ্জন আমার জীবিকার অন্নে স্বাদ এনে দিয়েছে। যখন আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি আসে সবুজ মাঠের মধ্যে, জলে জলময় হয়ে যায় শহর ও গ্রাম, যখন কোনওদিন কুয়াশায় ছেয়ে যায় চরাচর, মধ্যরাতে ডাকবাংলোর জানলায় চাঁদ উঠে আসে দেবদারু পাতার মধ্যে, কিংবা যখন এসব কিছুই হয় না, ধুলোপায়ে গ্রামের কৃষক সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বলে, 'আমার বিষয়টা কি হলো' কোথায় যেন সব কিছু আগাগোড়া এক হয়ে যায়। কোনও পার্থক্য থাকে না পরিশ্রমে ও কল্পনায়, কোনও প্রভেদ থাকে না জীবিকা ও কবিতায়। সেই আমার আনন্দ।

'নিতান্ত নিজের মতো' এই শিরোনাম নিয়ে এ গদ্যরচনাটি ছাপা হয়েছিল ১৯৮০ সালের, সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায়। ওই সাহিত্য সংখ্যাটিতে, পঞ্চাশ দশকের কয়েকজন কবি, তাঁরা কেন কীভাবে কবিতা লিখতে শুরু করলেন ও কোন পথে বিকাশ লাভ করল তাঁদের কবিতা—এ বিষয়ে আত্মস্মৃতিমূলক গদ্য লিখেছিলেন। তারাপদ রায়ের গদ্যটির একেবারে শেষাংশটুকু দিলাম এখানে। এই যে রয়েছে, 'ধুলো পায়ে গ্রামের কৃষক সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে আমার বিষয়টা কি হল...' একে আমরা তারাপদ রায়ের কবিতাতেও উঠে আসতে দেখব। একবার নয়। বারবার।

অর্থাৎ নিজের জীবিকার জন্য যে-অভিজ্ঞতা লাভ করছেন, তাকেও উত্তীর্ণ করছেন কবিতায়। 'আমার বিষয়টা' নামেই একটি কবিতা আছে তারাপদ রায়ের, 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু' বই-এ। ঠিক পরের কবিতাটাই হল 'পপার'

পপার

এখন জরিপ হবে, তাঁবু ফেলে কানুনগো, আমিন
বসে আছে চতুর্দিকে। খুঁটি পুঁতে, চেন ফেলে ফেলে
কঠিন হিসাব হবে চুলচেরা; এই এক ছটাক
জমি ঠিক কার প্রাপ্য? তোমার স্বর্গীয় পিতামহ
পপার ছিলো হে, তুমি কিছুই পাবে না, ঐ ছায়া,
বাদাম গাছের নীচে ভিটে বাড়ি, হলুদ পুকুর,
তুমি ভালোবেসেছিলে; কিন্তু খতিয়ানে অন্য নাম,
অন্যান্য ব্যক্তির দাবি আইনসঙ্গত। কিছু আছে,
দখল প্রমাণ, দানপত্র কিংবা ডিক্রি আদালতে?
কিছু নেই, কী আশায় এই রৌদ্রে হেঁটে এসেছিলে,
এতো পথ, গ্রামের সীমার বাইরে সেটলমেন্ট তাঁবু
অথচ টাউট নও, তবু কেন প্রত্যেক তাঁবুতে
ঘোরাফেরা; বে-হক সম্পত্তি নিয়ে কেন এতো লোভ
সবচেয়ে ছায়াওয়ালা বাড়ি, সবচেয়ে ঠাণ্ডা জল
শ্যাওলার দামে ঢাকা অবাস্তর হলুদ পুকুর :
কেন এতো লোভ করো? উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি
গৃহহীন, ভূমিহীন, ছায়াহীন সামান্য পপার।

এই কবিতায় জরিপ, কানুনগো, আমিন, সেটলমেন্ট তাঁবু এইসব বিষয় রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে বাংলার গ্রাম। বাংলার সামান্য কৃষক। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু' কাব্যপুস্তকে এইসব বিষয় এসে পড়েছে—এর ঠিক পরের সময়টায় যাঁরা নবীন কথাশিল্পী হিসেবে দেখা দেবেন, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, অনিতা অগ্নিহোত্রী—তাঁদের লেখায় লেখায় বাংলার এই গ্রাম, জমি, দরিদ্র মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রকাশ পেতে থাকবে। অন্যদিকে, এইসব তখন-পর্যন্ত-তরুণ শক্তিমান সাহিত্যকারদের পুরোধা হয়ে থাকবেন মহাশ্বেতা দেবী। তারাপদ রায়ের এইসব কবিতা কোথাও তারই পূর্বাভাস ধরে রেখেছিল যেন।

বেশ কিছুকাল হল বাংলায় প্রতি-কবিতা, বা অ্যান্টি-পোয়েট্রি কথাটা এসেছে, এবং এই অভিধা-টি অনেকের কবিতাই গ্রহণ বা ঘোষণা করেছে। তারাপদ রায়ের ক্ষেত্রে এটা বলা হয় না। কিন্তু, পঞ্চাশ দশকের এই কবির বহু কবিতায়, এর চিহ্ন দেখা যায়, কোনও ঘোষণা ছাড়াই।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে
যে মিছিলটি রাস্তায় বেরিয়েছিলো,
তার ফেস্টুনের বংশদণ্ডের এবং কাপড়ের
আকার ও আয়তন
গত বছরের তুলনায় এ বছর অনেক কম,
ফলে শ্লোগানগুলিও কিঞ্চিৎ ছোট—
এবং এসবের কারণ হলো,
গত বছরের তুলনায় এ বছর
বাঁশ ও কাপড়ের দাম অনেক বেশি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উপর বক্তৃতা দিতে
যে প্রবীণ অধ্যাপক গতকাল বিকেলে
বণিকসভায় এসেছিলেন,
তিনি বললেন, 'আপনারা আমার পারিশ্রমিকটা
তিনশো টাকা বাড়িয়ে দেবেন,
জিনিসপত্রের যা দাম।'

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে
এইমাত্র একজন ভিখিরি
একটা দু পয়সা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে
খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলো।

এই 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি' নামক কবিতা আজকের দিনেও প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। 'দারিদ্ররেখা' নামক তাঁর চেনাজানা কবিতাটিতে এক জায়গায় যেমন আছে :

এবার আপনি একটি ব্ল্যাক-বোর্ড নিয়ে এসেছেন,
সেখানে চকখড়ি দিয়ে যত্ন করে
একটা ঝকঝকে লম্বা লাইন টেনে দিয়েছেন;
এবার বড় পরিশ্রম হয়েছে আপনার,
কপালের ঘাম মুছে আমাকে বলেছেন,
এই যে রেখা দেখছ, এর নীচে,
অনেক নীচে তুমি রয়েছো।

তারাপদ কবিতা লিখেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, এবং নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ ভেবে। ট্রেনে যাতায়াত করার অভিজ্ঞতা তাঁর একটি কবিতায় ফুটেছে—এ কবিতা নব্বই

দশকের সূচনায় রচিত, যখন একবিংশ শতাব্দীর আগমন নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। সেই 'টোয়েনটি আপ' কবিতা থেকে কয়েক লাইন বলি

টোয়েনটি আপ
একবিংশ শতক একেবারে দোরগোড়ায় এসে গেছে।
ব্রড গেজ ধরে ছুটে চলেছে টোয়েনটি আপ,
জীর্ণ কামরায় খঞ্জনী বাজাচ্ছে কানা ভিখারিণী,
'অন্ধ হয়ে মাগো কত কষ্ট পাই।'
তার ফোলা পেটের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে বড় হচ্ছে
একবিংশ শতকের এক নম্বর ভিখারি।
সেও কামরায় ওই খঞ্জনী বাজাবে
'খঞ্জ হয়ে মাগো কত কষ্ট পাই।'
দ্রুত ছুটে আসছে তার দিন,
একবিংশ শতক প্রায় এসে গেলো।

পুরো বিবরণধর্মী এইসব কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এক অনতিক্রম্য মায়া। অন্ধ-প্রায়, ছানি-পড়া রাস্তার কুকুরের জন্য কবিতা আছে তাঁর। কবিতা আছে হারিয়ে যাওয়া বেড়ালছানাকে নিয়ে, অচেনা ভিখারিণীকে তাঁর কবিতায় এইমাত্র দেখলেন, সেই ভিখারিণী যাকে পূর্ণগর্ভা অবস্থাতে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে হচ্ছে! নিজের মধ্যে থেকে শুরু হয় তারাপদ রায়ের কবিতা। তার প্রায় সব কবিতায় তিনি নিজে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে তাঁর দু'হাত বাড়ানো ভালবাসা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মানুষ, গাছপালা, পশুপক্ষী, এমনকী প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যেও। যেমন এই কবিতাটি।

ঠাণ্ডা মেসিন
সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
আমাদের পুরনো ঠাণ্ডা মেসিন।
বারান্দায় গিয়ে তাকিয়ে দেখলাম,
রঙচটা, পায়াভাঙা, নড়বড়ে
পঁচিশ বছরের পুরনো
আমাদের ঠাণ্ডা মেসিন
ঠেলাগাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে।

তাতাই বড় হচ্ছে,
আমরা বাসা বদলাচ্ছি,
সেই সঙ্গে বদলাচ্ছে মিনতি ও বিজন।
আমি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে,
এক কলম থেকে অন্য কলমে,
দাদা-বাবা-মা, বড় দিদিমা-রাঙা পিসিমা,
চন্দ্রবিন্দু।

এক বাটি ঝোলের মধ্যে এক টুকরো মাছ,
এক ফালি তরমুজ, সিকি বোতল দুধ।
আমরা আর একটা ঠাণ্ডা মেসিন।

ঠেলা গাড়িটা দূরে চলে গেলো।
এখন আর বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে না
অনেকদিন আগের এক জামগাছের নীচে
একটা খড়ে ছাওয়া গোয়ালঘর
আমার ঠাকুমার দেয়া একটা সিঁদুরের ফোঁটা
আমাদের বুড়ি লক্ষ্মী গাইয়ের কপালে
সেদিন কশাইরা তাকে নিয়ে গিয়েছিলো।

বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে মনে হলো
একটা সিঁদুরের ফোঁটা কম পড়ে গেলো,
আমাদের ঠাণ্ডা মেসিনের কপালে।

বাড়ির একটি পুরনো ফ্রিজ বিক্রি করে দেওয়া হল, বা হয়তো বদলে অন্য ফ্রিজ দিয়ে যাবে দোকান থেকে। তাই তারা লোক আর ঠেলা গাড়ি পাঠিয়েছে, আর নিয়ে যাচ্ছে পুরনো ফ্রিজটা। পঁচিশ বছরের পুরনো। এই কবিতায় লেখকের পরিবারে সকলে উপস্থিত। স্ত্রী মিনতি রায়, পুত্র তাতাই এবং লেখকের ভাই বিজন। বাসা বদল হচ্ছে। তার সঙ্গে মানুষগুলোও সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে। এই কবিতায়, আছেন দাদা-বাবা-মা, বড় দিদিমা, রাঙা পিসিমা। এঁদের নামের পরের লাইনে একটাই শব্দ। চন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ এঁরা কেউই নেই। লেখকের নিকট আত্মীয় এঁরা। ছিলেন। এখন নেই। তারপরের ছোট্ট তিন লাইনে, একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কীভাবে চলত, হয়তো টেনেটুনে চলত। তার ছবি। স্কেচের মতো দু-এক টানে আঁকা। বারান্দা থেকে দেখতে দেখতে একসময় আর দেখা গেল না। ফ্রিজ নিয়ে চলা ঠেলা গাড়িটা। আর অতীত থেকে ফিরে এল দেশের বাড়ির স্মৃতি। বুড়ি লক্ষ্মী গাইয়ের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঠাকুমা। আর কসাইদের নিয়ে যাওয়া। কবিতার শেষ তিনটি লাইনে এসে চোখে জল আসতে চায়। সেই বুড়ি লক্ষ্মী গাইয়ের শোকে! না কি, প্রাণহীন জড়বস্তু ওই যন্ত্রটির জন্য! ওই ঠান্ডা মেসিন এই পঁচিশ বছর ধরে একটি পরিবারের মধ্যে বাস করেছে, সুখে-দুঃখে। সে কবে যেন পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। ওই যে দাদা-বাবা-মা। বড় দিদিমা-রাঙা পিসিমা—তারপর চন্দ্রবিন্দু দিয়ে সকলের ছেড়ে যাওয়া, চলে যাওয়া বোঝানো হয়েছিল তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল এই ঠান্ডা মেসিনের চলে যাওয়া। বুড়ি হয়ে যাওয়া লক্ষ্মী গাই, তাকে তো কসাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমরা, মানুষ তো এটাই করে—আর ঠাকুমার হাতের ওই সিঁদুর ফোঁটা, ও কি স্নেহের চিহ্ন নাকি নিষ্ঠুরতার?—সেই প্রশ্নের জবাব পাঠক খুঁজতে থাকেন। কিন্তু এটা বোঝা যায়, যে নিজের পরিবার থেকে যে-ভালবাসা শুরু হয়েছিল, তা জড়বস্তুকে অন্তর্গত করে নিল নিজের স্নেহের পরিধির মধ্যে—সেই জড় আর জড় রইল না। তার মধ্যে যেন প্রাণ যুক্ত করলেন কবি, নিজের ভালবাসা প্রবিষ্ট করিয়ে। দাদা-বাবা-মা, বড়দিদিমা-রাঙা পিসিমা আর নেই—মিনতি, বিজন, তাতাই আছে—কিন্তু সব মিলিয়েই কবির পরিবার। যাঁরা নেই—তাঁরাও আছেন। মনে, স্নেহস্মৃতির মধ্যে। নেই বুড়ি লক্ষ্মী গাই। নেই ঠান্ডা মেসিন। তবু তারা রইল। তারা থাকে। আমাদের 'অবান্তর স্মৃতির ভিতর।' 'অশ্রু ঝলোমলো' হয়ে থাকে?

এই অসামান্য কবিতাটির মতো তারাপদ রায়ের আরও অনেক কবিতাই চোখের আড়ালে থেকে গিয়েছে। প্রতি-কবিতার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম একটু আগে। প্রতি-কবিতার যে রচনাপদ্ধতি তার একটি লক্ষ হল লিরিকের চলার ধরনে একেবারে পা না-রাখা। লিরিক, গীতলকাব্যকে তা অস্বীকার করতে চায়। একেবারে প্রথম জীবনে—সব কবির ভেতরেই যেমন কবিতার চলতি ফর্ম বা জনপ্রিয় ধরনগুলোর প্রতি বিরোধিতা থাকে—তারাপদ রায়েরও ছিল। লিখেছিলেন তিনি

রবীন্দ্রনাথের প্রতি
কে আপনাকে বলেছিল, 'বসন্ত রোদন ভরা'
আপনি দেখেছিলেন?
হায়! হায়!
আপনি সব জেনে শুনে আমাদের সর্বনাশ করে গেছেন,
যেদিকে তাকাই শুধু লিরিকের লতা,
হাওয়ায় গড়িয়ে পড়ে,
ন্যাকা মেয়েছেলে যেন কিছুই জানে না।

লিরিকের প্রতি এই বিরক্তি তাঁর—অথচ যাঁর ভিতরে এত স্নেহ, ভালবাসার এতখানি ঝরনাধারা বইছে, তার অন্তরে তো লিরিক থাকবেই। এবার যে কবিতাটি বলছি, সেই লেখা এক

আশ্চর্য লিরিক কিন্তু কী অভাবিত তার উপস্থাপনা—

নিসর্গ
শ্রীমতী নিসর্গসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শেষবার দেখা হলো
রাণাঘাট শহর পেরিয়ে চূর্ণী-নদীর উত্তর পারে।

তখন বিকেল বেলা
একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে, পশ্চিমে কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে
সার্চলাইটের মতো দেখা যাচ্ছে লম্বা-লম্বি রোদের রেখা।
একটা রামধনু পূর্ণবৃত্ত হবে কি অর্ধবৃত্ত হবে
এ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মনস্থির করার জন্যে
তিন মিনিট সময় নিল,
একটু পরে ম্যাজিক

দমকা হাওয়ায় মেঘের তাঁবু ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ল
কিন্তু তার নীচে বিশ্রামরত রামধনুর রা পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

তখন ধানখেতের মধ্য থেকে জোর বৃষ্টি
সারা শরীর ভেজা, মাথার চুল দিয়ে জল পড়ছে।

আলের ওপর দিয়ে সোজাসুজি হেঁটে
ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে এলেন স্বয়ং নিসর্গসুন্দরী দেবী।

অনেক দিন পরে দেখা তবু চিনতে পারলাম,
হাত তুলে নমস্কার করলাম,
শ্রীমতী নিসর্গসুন্দরী মৃদু হেসে বললেন,
'এ বছর আর রামধনু হবে না, আবার সামনের বছর,'
বলে হাসতে হাসতে বৃষ্টিতে মিলিয়ে গেলেন।

এই কবিতা প্রকৃতির, নিসর্গের। এই কবিতা পড়ে আমাদের মন ভাল হয়ে যায়। এত প্রসন্ন সুন্দর একটি আলো মনে এসে লাগে যেন মনে হয় পুরো দৃশ্যটি আমরা দেখলাম। জীবনে কিছুই থাকে না। হারিয়ে যায়। কিন্তু তারাপদ রায়ের কবিতার পৃথিবীতে সব ক্ষণস্থায়ীরাই একটিই কথা বলে, আমি আছি, থেকে যাব। থেকে যাব। একটা গাছ কাটা হয়ে গিয়েছে, তাই নিয়ে কবিতা লিখছেন তারাপদ রায়, কোথাও বলছেন না গাছটা কাটা হয়েছে। বলছেন এখানে একটা আমলকি গাছ ছিল/এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না/হয় তো এদিক ওদিক বেড়াতে গেছে/কুটুম্বিতা করতে গেছে দূরে গ্রামে।

এই দেখাটার মধ্যে একটা আশ্চর্য বিশ্বাস আছে। যা সব ক্ষতিকে, নষ্টকে, বিনাশকে পার হয়ে যায়। এই কবিতারই শেষে বলছেন

এখানে একটা আমলকি গাছ
আমি দেখতে পাচ্ছি না
কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি
গাছটা এখানেই আছে
তার পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে এসে
ঝিরিঝিরি হাওয়া লাগছে আমার শরীরে।

কবিতাটির নাম : গাছটা এখানেই আছে। এই আছে, আছে, আছে, এইটাই শীতল সান্ত্বনাদাত্রী বাতাসজননীর মতো থেকে-থেকেই বয়ে আসে তারাপদ রায়ের কবিতার ভিতর দিয়ে। যা চলে গিয়েছে, তা চলে যায়নি। তা থেকে গিয়েছে মনে-থাকা হয়ে, মনে-পড়া হয়ে। সে তাঁর পূর্ববঙ্গের ছেলেবেলাই হোক, তাঁর দেখা নদী-গাছ-পাখি-প্রকৃতিই হোক। আর অজস্র অসামান্যতা নিয়ে অগণন সাধারণ মানুষই হোক। আছে। তারাপদ রায়ও আছেন। তিনিও চলে যাননি। তাঁর কবিতা, কাব্যজগতে এই মুহূর্তে খুব বড় স্বীকৃতি না-পেলেও, সে স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন পাঠকের মনে-মনে ঘুরে চলা তাঁর কবিতার মধ্যে।

তারাপদ রায় ভালবাসতেন সকলের হাসিমুখ দেখতে। তাঁর কবিতা অতটা না-পৌঁছলেও তাঁর কৌতুক কাহিনিমালা পৌঁছে গিয়েছে ঘরে-ঘরে। এখনকার সমস্ত বাঙালি শিশুই বড়ো হয়েছে ডোডোতাতাই পড়ে। স্বচ্ছ নির্মল প্রসন্ন তাঁর রসরচনা 'বিদ্যাবুদ্ধি' 'কাণ্ডজ্ঞান' পড়েননি এমন বাঙালি দুর্লভ। তারাপদ রায়ের দু'টি কৌতুক-মেশানো কবিতা দিয়ে 'গোসাঁইবাগান' আজকের মতো শেষ করব।

কি রকম ব্যবহার
একজন কবির কাছে আরেকজন কবি
কি রকম ব্যবহার আশা করে?
কি রকম ব্যবহার?
সকলের ইতিহাসবোধ নেই, ঘরে ঘরে আলেকজান্দার
খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।
কিন্তু ঘরে ঘরে শুধু কবি,
একজন কবির সঙ্গে আরেকজন কবির
কম বেশি দু-এক ফুটের ব্যবধান,
একটা বাড়ির মধ্যে,
একটা গাড়ির মধ্যে,
একটা টেবিল ঘিরে,
একটা মাইক জুড়ে,
দলে দলে কবি,
যে রকম পঙ্গপাল, দেয়ালির অন্ধ শ্যামাপোকা।
তবুও কবির কাছে কবি
একজন নিরীহ কবির কাছে
একজন মারকুটে কবি,
একজন বকবক কবির কাছে
একজন চুপচাপ কবি '
একজন মাতাল কবির কাছে
একজন গঙ্গাজল কবি
কি রকম ব্যবহার আশা করে,
কি রকম ব্যবহার, আলেকজান্দার?

গাব্বু
আমি জানি গাব্বু ছাড়া আর কেউ লেখেনা কবিতা।
আমি জানি গাব্বু ছাড়া আর কেউ পড়ে না কবিতা।।
আমি জানি গাব্বু ছাড়া আর কেউ বোঝেনা কবিতা।
আমি জানি গাব্বু ছাড়া আর কেউ শোনেনা কবিতা।।

গাব্বুই গাব্বুর জন্যে লিখে যায় গাব্বু-গাব্বু অসংখ্য কবিতা।
গাব্বুই গাব্বুর সব ভাই-বন্ধু বড় বাবু মাতা কিংবা পিতা।।
গাব্বুর কিছুই নেই শুধু আছে গাব্বু-গাব্বু অসংখ্য কবিতা।
গাব্বুই গাব্বুর জন্যে রেখে যায় গাব্বু-গাব্বু অসংখ্য কবিতা।

আমি জানি, সব জানি গাব্বুদের গাব্বু-গাব্বু সমস্তই জানি।
আমি জানি গাব্বু ছাড়া কবিতার বন্ধু নেই সমস্তই জানি।
কিন্তু আমি এখনো জানি না কিন্তু আমি কিন্তু এখনো জানি না?
গাব্বু শব্দটির মানে, কোনো মানে, প্রকৃতই অর্থ আছে কিনা??

এই দ্বিতীয় কবিতাটি, সুষম ছন্দে-মিলে রচিত হলেও, প্রতি-কবিতার একটি অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। একটাই শব্দ, তাকে প্রতি মুহূর্তে নতুন ও একদম অভাবনীয়ভাবে ব্যবহার করে চলেছে এই কবিতা। এই শব্দটির প্রতিটি ব্যবহার থেকে যে কোনও পাঠক যে কোনও অর্থ তৈরি করে নিতে পারেন। 'গাব্বু'-র একেবারে নিজস্ব অর্থ যোগ করতে পারেন। এতটাই স্বাধীন ও মুক্ত এ লেখা।



ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
96202
Rs 200/-
Genesis 2878
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street (033) 22861510/11 Free School Street (033) 22861506

র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

যদি কেউ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উটপাখি না হয়, আলতো ড্যাবডেবিয়েও চারপাশ পানে তাকায়, বুঝতে পারবে মানুষের চেয়ে ইতর প্রাণী গজানো অসম্ভব। 'মনুষ্যেতর' শব্দটা অভিধান থেকে সপাটে তুলে দেওয়া উচিত। যদি কেউ বলে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', সে আসলে নিজের কোটেশনের আড়ালেই ঘাড় গুঁজে লুকোবার চেষ্টা করছে, আদ্দিন ধরে সমস্ত প্রাণশক্তি ও আনন্দশক্তি দিয়ে গেঁথে তোলা প্রত্যয় খানখান হচ্ছে দেখে কোনওমতে একটা স্বরচিত শ্লোক খাড়া করে তার আশ্রয়ে নিবু-নিবু বাতিকে আড়াল করছে। আমাদের হোস্টেলে একটা ছেলে হাসির থুতু ছুটিয়ে গল্প করেছিল, তাদের পাড়ায় কী রসিয়ে রসিয়ে পাঞ্জাবিদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী মার্ডারের পর, তার বাবা-কাকা কী দুর্দান্ত লিড করেছে সেই অপারেশন। সব্বাই বলেছে, সত্যি দাদা, আপনারা না থাকলে পাঁইয়াগুলোকে এভাবে ঝলসানোই যেত না। কী মাথা আপনাদের! আরে শালা, আমাদের মাথা থাকবে না তো কি বাঁধাকপিদের থাকবে? ঠিকই তো, বাঁধাকপিরা ভেবেছিল, আগের মুহূর্ত অবধি 'ভাবী, একটু লস্কা হবে?', 'ভাবী, লক্ষ্মীপুজো হয়েছিল, এই যে প্রসাদ' বলা লোকগুলো হঠাৎ ল্যাংটো করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেবে না। যে গল্পটা সবচেয়ে হিট: দোকানঘরে বন্ধ করে বউ আর দুই ছেলেমেয়েকে পুড়িয়ে কয়লা করা হয়েছে, হাজব্যান্ডটা কোথায় গিয়েছিল, তখনও ফেরেনি। এবার সবাই তো ওৎ পেতে আছে। সে ফিরতেই গলির মোড় থেকে সঙ্গ নিল বাবা-কাকা। পাশে পাশে গল্প করতে করতে আসছে। ইস, কী হয়ে গেল বলুন তো... কিছু কিছু পাড়ায় তো...। যাতে কোনও সন্দেহ না হয়, পালাতে না পারে। তারপর নিজের বাড়ির পাশে এসে খাক হয়ে যাওয়া জীবন দেখে যেই না লোকটা বজ্রাহত, বাবা-কাকার এক হুকুমে গলায় টায়ার ঝোলানো শেষ। তারপর আর কী, টায়ার জ্বালাও, কালীপুজোর দেড়া মজা নাও। পাঞ্জাবি-বাজি। এ গল্প সে বহু করেছে, আমরা শুনেছি, তার এঁটো বিস্কুট খেয়েওছি। হবে না কেন, এ তো সেই সমাজ, যেখানে গণধোলাই হলে রিকশায় মাইক লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে অ্যানাউন্স করা হয়, অ্যালাকার জনসাধাওন দলে দলে যোগ দিন। দেয়ও সবাই। সাধ্যমতো যেটুকু পারে করে। প্রাচীন কৌম রিচুয়াল। কেউ যুতিষ্ঠ গরম জল করে আনে, লোকটার গায়ে ঢালবে। কেউ 'এই শুয়োরের বাচ্চা, লজ্জা করে না, ইঁ? ইঁ?' বলে, আর প্রতিটি ইঁ-তে একটা একটা করে আঙুল উল্টোদিকে বেঁকিয়ে মটাৎ মটাৎ করে ভাঙে। শার্প বাখারি দিয়ে চোখদু'টো গেলে দেওয়ার আগে চোখের মণিগুলো সাদা জমিটুকুর মধ্যে আকুলিবিকুলি ছটফট করে ঘোরে, পালাতে চায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, একথা যারা বলে, তারাও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ঠিকই। তাদের আলগা কথায় বেরিয়ে আসে ধারণা: এই গ্রহে বয়ে চলেছে এক ন্যায়বিচারের স্রোত। তারা বলে, 'আমার এতখানি ক্ষতি করল তো, দেখবি, ওর কক্ষনও ভাল হবে না।' 'কতগুলো মেয়ের সংসার ভেঙেছে বাবা, ওর সেরিব্রাল হবে না তো কার হবে?' অর্থাৎ, অন্যায় করলে, কড়ায়গণ্ডায় শাস্তি পেতে হবে। তোমার জীবনের প্রতি একজন নিয়ন্ত্রক লক্ষ রাখছেন, হিসেব কষছেন, যথাসময়ে ঝাড় খাবে। একটা বিরাট সুবিচার, একটা সমীচীনতা, ন্যায়বত্তা—অস্তিত্ববান এবং জাগ্রত। টোটাল বকওয়াস। কোটি কোটি শয়তান লোক উত্তুঙ্গ মজায় আছে। খুনিরা ক্যাবিনেট মিনিস্টার হচ্ছে। বাবা মাটিতে শুয়ে আছে আর মস্তান মেয়েকে খাটে ধর্ষণ করছে, একমাস-দু'মাস। একসঙ্গে বসে তিনজন তড়কা খাচ্ছে। তারপর বাবাকে নিয়েই মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলছে। ট্রাক বিচ্ছিরিভাবে ওভারটেক করছিল বলে চিল্লিয়েছে যে লোকটা, তাকে কয়েকজন ড্রাইভার মিলে নামিয়ে চ্যাংদোলা করে চিৎ-শুইয়ে দিচ্ছে রাস্তার মাঝখানে, আর তার ওপর দিয়ে মহানন্দে ট্রাক চালিয়ে দিচ্ছে গাল-খাওয়া ইগো-বীর। তার পাঁচ বছরের ছেলে আছাড়িপিছাড়ি কাঁদছে আর বাপের খুন দেখছে। তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত এরকম দুশোছেষট্টিটা তবু খুঁজে বার করলেও আর বঙ্গভাণ্ডার খুঁটে তিনলাখ পজিটিভ বায়বীয় বিশেষ্য ঝাড়লেও পৃথিবীকে জাস্টিফাই করা যাবে না। ওতে সুচারু শিল্প হয়, আর কোনও ট্যাড়স গজায় না।

বিশালহৃদয়দের ফান্ডাটা হল: জীবন এক বিরাট নকশি কাঁথা, তার এপ্রান্তে অন্যায় হলে, ওপ্রান্তে ঠিকই একটা ললিত ক্ষতিপূরণ গজাচ্ছে। তুমি যদি গ্র্যান্ড ডিজাইন-টা বোঝো, পূর্ণ সুবন্দোবস্তখান, দেখবে সবই ঠিক আছে। মাংসের নিত্যতা সূত্র আর কী। তুমি মুরগিকে খাচ্ছ, সে মাংস তোমাতে লাগছে। ফলে মুরগি গেল, মাংস একই রইল। অনেক ওপর থেকে দেখলে যেমন গড়িয়াহাটের উন্মত্ত ভিড় ও হুড়মতাল নড়নচড়নের মধ্যেও একটা আরিব্বাস ক্যালাইডোস্কোপ-বাচক নিখুঁত শিল্পিত প্যাটার্ন, কিংবা আই-লেভেলে দেখলে শুধু লোক নাহক গাদাগাদি কিন্তু স্টেডিয়ামের উঁচু গ্যালারি থেকে ও হরি ওরা সবাই মিলে হরফ তৈরি করে লিখছে জয় হিন্দ, তেমনই। বাইরে দাঁড়াও, উঁচুতে ঝোলো, বুঝবে, আখেরে কম্পেনসেশন আছে। এক হরিণকে বাঘে খাচ্ছে আরেক শাবক জঠর থেকে নাক বাড়াচ্ছে। কী ঘণ্টা এতে হল কে জানে। আমার ক্ষতি হল আর সাউথ আফ্রিকায় একজনের জন্মদিনে অপ্রত্যাশিত কেক এল, গুয়াতেমালার এক রমণীকে চারজন বলাৎকার করে যোনি ছিঁড়ে দিল আর বাগুইহাটিতে একজন লটারি পেল, এই যদি ন্যায়-নকশার ফর্মা হয়, তা হলে সেই জাস্টিস-বাগীশের শরণাপন্ন না-হওয়ার মধ্যেই প্রকৃত ডিগনিটি আছে।

যদি বিশ্বে সত্যি কোথাও কোনও সদিচ্ছাময় বিন্যাস থাকত, একটা শ্যামাপোকার প্রাণও বৃথা ভলে যেত না। বস্তিতে সেদিন একটা কুকুরছানাকে বাচ্চারা টিলিয়ে মারল। এমনিতেই বাচ্চাদের মতো খতরনাক আর হৃদয়হীন পাবলিক হয় না। তার ওপর অশিক্ষিতরা বারণ পায় কম। প্রথমে কুকুরটার পেছনের পাগুলো ভেঙে গেল। তখন তাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল রাস্তা দিয়ে, গলায় দড়ি বেঁধে। মহানন্দ। সে যখন আর আর্তনাদও পারছে না, পুরো নীচেটা ছড়ে ব্লিড করে শেষ, তখন একটা খুঁটিতে বেঁধে, সবাই পাটকেল দিয়ে টিপ প্র্যাকটিস চালাল। তিনদিনব্যাপী খুন। এই র‍্যান্ডম আনতাবড়ি দলামোচড়ার দিনে বেশ আতস কাচ বাগিয়ে কেউ যদি সত্যি মহান সন্নিবদ্ধ অভিপ্রায় দেখতে পান, তা হলে তিনি হয়তো ট্রেন উল্টে সাতাত্তর জনের মরে যাওয়া, তিন বছরের বাচ্চার খেলতে খেলতে সেপটিক ট্যাংকে পড়ে পায়খানায় দম আটকে মরে যাওয়া বা অ্যাটম বোম পড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পঙ্গু বিকৃত হীনমন ছত্রখান হয়ে যাওয়াকেও সঙ্গত বকলাতে পারবেন। তালিয়াঁ।

ঈশ্বর আছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। সচেতন ও সুপার-অভিসন্ধিপরায়ণ কোনও শক্তি না থাকলে মানুষের পেছনে এমন অব্যর্থ বাঁশ দেওয়া যায় না। তোকে সারাজীবন সুখ দেব না, শুধু লোকে এসে অপমান করবে গলা টিপবে তুই শুধু হেঁসেল ঠেলবি খিস্তি খাবি আর শেষ জীবনে ক্যান্সার দিয়ে সোনায় সোহাগা সাঁটব, এ চিত্রনাট্য পরিকল্পিত বদমাইশি ছাড়া তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। স্টেট-স্পনসর্ড খুন, দাঙ্গা, এথনিক



ক্রেনজিং-এর পর তার হোতা আইকন হিসেবে পূজিত হচ্ছেন, আর ইভ-টিজিং-এর প্রতিবাদ করে তুরন্ত রড খেয়ে মানুষ অক্কা যাচ্ছেন—এতে ভগবানের একটা স্পষ্ট, ঠান্ডা মেসেজ আছে। ক্যালিগুলা-ছাপ্পা মেসেজ। তা হল : আমি হনু স্বেচ্ছাচারী শয়তান—না, নেসেসারিলি শয়তান না—স্বেচ্ছাচারী সর্বশক্তিমান, ভালও করতে পারি, মন্দও করতে পারি, উদাসীনও থাকতে পারি, যায়িচ্ছে, হোয়াটেভার। র‍্যান্ডম। যুক্তিরহিত। মূল্যবোধ-বেতোয়াক্কা। আমার কোষ্ঠসাফের ওপর নির্ভর করছে আমি ভূমিকম্পটা করাব কি না। আমার শক্তি এত বেশি, কোনও আচরণের জন্য আমি কারও কাছে কোনও যুক্তি, কৈফিয়ত, সমঝ-সূত্র দিতে বাধ্য নই। বালিকা কোন পুতুলের ঘাড় মটকাবে আর কাকে মামারবাড়ি বেড়াতে নেবে, তার জন্য সে কি পুতুলকে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ? আমার প্রজা হিসেবে তোমার কাজ শুধু এই এলোপাথাড়িপনাকে ভুলে থেকে বা প্রচণ্ড ভয় করে, কাঁপতে কাঁপতে বা আলাভোলা কাছাখোলা থিমে, জীবনের মধ্যে দিয়ে মানে মানে পায়চারি, এবং খামোকা কানচাপাটি না-খেলেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবা।

মানুষকে ঈশ্বর নিজের ইমেজেই তৈরি করেছেন। ক্লোন, যারে কয়। ঈশ্বরে-মানুষে সাংঘাতিক মাসতুতো। ফলে, ভদ্র, শিক্ষিত ও অনুভূতিসম্পন্ন যদি কেউ থাকেন, তাঁর একমাত্র কর্তব্য, এই ঈশ্বর ও এই মানুষের ছোঁয়াচ যথাসম্ভব বাঁচিয়ে, সিঁটিয়ে সরু হয়ে দম আটকে যাপন। রক্তকাশের রোগী পাগলা-ভিড় ট্রেনে ঠিক পাশে বসে থাকলে আপনি মুখটাকে যেমন যতটা পারেন অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখেন আর গা-জোয়ারি আশা করেন ভাইরাসগুলো ঠিক আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যত্র উড়ে যাচ্ছে, সমান ওয়াক ও ত্রাণকামনা মেশানো মনোবৃত্তি নিয়ে আপনাকে ঘিনঘিনে সহ-মানুষদের সঙ্গে মিশতে হবে, নরকের মধ্যে দিয়ে নাকে রুমাল না-চেপেই দ্রুত জগিং অভ্যাস করতে হবে, নরক মানে যে আপনার চারপাশের অন্য সব মানুষ, আর কিছুই নয়, এই সার্ত্র-বচনে বিশ্বাস রাখতে হবে, এবং নিয়ত কান্নার দলা গিলে গিলে ওপরে বসা মিটিমিটি হাসন্ত ডেসপটের দিকে লুকিয়েচুরিয়ে লাথি দেখাতে হবে। দেখুন, কদ্দূর পারেন।

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

দলিত পার্টির নেতা কেশব রামের বক্তৃতা শুনতে কালীঘাট থেকে মেট্রোয় এসপ্ল্যানেড আসে গোরা। কিন্তু মেট্রোর গোলমালে, তা আর হয়ে ওঠে না। অগত্যা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে, কার্জন পার্কের দিকে। যেতে যেতে এক জটাধারী সাধুর মুখোমুখি হয়। সাধুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে গেলে, এক ফোটোগ্রাফার তুলে রাখে সেই ছবি। ফেরার পথে মেট্রোর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আচমকা দেখা হয়ে যায় সেই ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে।

৩

সুশোভনদার ফোনটা পেয়ে, জয়দেব স্থান-কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আপনি কোথায়? আপনার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করে করে, এইমাত্র আমি ফিরে এলাম।'

ও প্রান্ত থেকে সুশোভনদা বললেন, 'শোনো, বেশি কথা বলার সময় আমার নেই। কাজের কথাটা আগে সেরে নিই। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তুমি একটা প্যাকেট পেয়ে যাবে। কুরিয়ারের লোক তোমার কাছে প্যাকেট-টা পৌঁছে দেবে। সেটা খুললেই তুমি সব বুঝতে পেরে যাবে। আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করো না। বিপদে পড়বে। এখন ছাড়ি, কেমন!'

জয়দেব বলল, 'এক মিনিট সুশোভনদা। আপনার লেখাটাও কি ওই প্যাকেটের মধ্যে আছে?'

'আছে। শোনো জয়দেব, আমি দিন কয়েকের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি। দরকার হলে পরে নিজেই তোমাকে ফোন করব। ছাড়ছি।'

বলেই সুশোভনদা ফোনটা ছেড়ে দিলেন। রাস্তায় কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়দেব। এই হেঁয়ালির মানেটা ও বুঝতে পারল না। সুশোভনদা হুটহাট বাইরে চলে যান, সেটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগে বহুবার গিয়েছেন। কিন্তু এবারের যাওয়ার মধ্যে কীরকম যেন একটা রহস্যের গন্ধ রয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের কথাবার্তা। তার মধ্যেই ওর মনে হল, সুশোভনদা কোনও বিপদে পড়েছেন। কারও ভয়ে উনি পালিয়ে যাচ্ছেন। না হলে কেন বললেন, ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে বিপদ হবে! খুব গভীরভাবে জয়দেব চিন্তা করতে লাগল। কথা বলার সময়, ফোনে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতে পাচ্ছিল ও। বড় রেল স্টেশনে যে ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়। একসঙ্গে অনেক লোকের কথা বলার আওয়াজ পাচ্ছিল। তা হলে কি সুশোভনদা কোনও স্টেশন থেকে কথা বলছিলেন? জয়দেব ফের স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। ওইসময় ঘোষিকা ঠিক কী বলছিলেন? তখনওই ওর মনে পড়ল, 'পাশকুড়া লোকাল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে...।' পাশকুড়া তো হাওড়া লাইনে। তার মানে সুশোভনদা নিশ্চয়ই হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করেছিলেন।

ট্রামে না উঠে, জয়দেব হাঁটতে হাঁটতেই ফিরে এল সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। ভ্যাপসা গরমে প্রচণ্ড ঘেমেছে। জামাটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। দোকানে উঠেই ও পাখার স্পিড-টা বাড়িয়ে দিল। দোকান বলতে পনেরো বাই দশ একটা ঘর। আর তাতে পুরনো আমলের কিছু আসবাব এবং ওদের প্রকাশিত বইয়ের সম্ভার। ওর বাবা জীবেন মিত্র এই প্রকাশনা সংস্থাটা শুরু করেছিলেন প্রায় তিরিশ বছর আগে। প্রথমদিকে তিনি শুধু পাঠ্যপুস্তক ছাপতেন। গিল্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন নামী সাহিত্যেকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়। মূলত, তাঁদেরই উৎসাহে বইমেলার সময় উনি একটা-দু'টো করে উপন্যাস, গল্পসমগ্র, প্রবন্ধ, জীবনীমূলক গ্রন্থ ছাপতে শুরু করেন। বাড়তে বাড়তে বইয়ের সংখ্যা এখন প্রায় দু'শো হয়ে গিয়েছে। এই ছোট্ট দোকানের আয় থেকেই ভালভাবে সংসার চালিয়েছেন ওর বাবা। দিদি আর ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। দিদির বিয়ে দিয়েছেন। বেহালায় একটা দোতলা বাড়িও রেখে গিয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর এখন ব্যবসা চালাচ্ছে জয়দেব।

দোকানে বাবার আমল থেকেই রয়েছেন সুরেশদা। বই ছাপার কাজকর্মগুলো উনিই দেখেন। 'দিনকাল' পত্রিকা চালানোর জন্য জয়দেব রেখেছে সুমিতা আর কৌশিক বলে দু'টি ছেলেমেয়েকে। এরা প্রুফ রিডিং থেকে এডিটিং—সব ধরনের কাজই করে। ঘোস্ট রাইটিং থেকে ইন্টারভিউও। ছেলেমেয়ে দু'টোকে নিজের হাতে গড়েপিটে নিয়েছে জয়দেব। কোনও কাজে ওরা না বলে না। দোকানে ঢুকে জয়দেব দেখল, কৌশিক নেই। কম্পিউটারের সামনে বসে সুমি কী যেন করছে। ও বলল, 'আমার নামে একটা প্যাকেট আসার কথা আছে সুমি। এলেই ওপরে পাঠিয়ে দিও, কেমন!'

মুখ তুলে সুমি ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'আপনি এসে গিয়েছেন, ভালই হল। প্রেস থেকে সুরেশবাবু একটু আগে জানতে চাইছিলেন, সুশোভনবাবু লেখাটা পাঠিয়েছেন কি না।'

জয়দেব বলল, 'সুরেশদার সঙ্গে আমি কথা বলে নিচ্ছি। তুমি কী করছ এখন?'



'আপনার এডিটোরিয়ালের প্রুফটা দেখে রাখছি। কেন জয়দা?'

'একটা গল্প বেছে এখুনি প্রেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করো তো। আর কৌশিক এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। দরকার আছে।'

পুরনো আমলের বাড়ি, সিলিং অনেক উঁচুতে। কাঠের তক্তা দিয়ে জয়দেব তাই দোকানের ভিতরই একটা তলা তৈরি করে নিয়েছে। নিরিবিলিতে লেখালেখির কাজ করতে সুবিধে হয় ওর। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ও ওপরে উঠে গেল। বেশ কিছুদিন ধরেই ও ভাবছে, একটা এয়ার কন্ডিশনড মেশিন বসিয়ে নেবে। কিন্তু বাড়িওয়ালা অংশুমানবাবুকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। দেওয়াল খোঁড়াখুড়ি করতে হবে। প্লাস ইলেকট্রিকের বিলের জন্য বাড়তি কত দিতে হবে, তা নিয়েও কথা বলা দরকার। নিজের চেয়ারে বসে জয়দেব টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

প্লাস্টিকের ট্রে-তে কয়েকটা চিঠি পড়ে আছে। পত্রিকা সংক্রান্ত কিছু চিঠি। তার মধ্যে সাদা-লম্বা একটা খাম দেখে, জয়দেব সেটা তুলে আনল। দেখেই ও বুঝতে পারল, পুরী থেকে পাঠিয়েছেন অবধূত গোস্বামী। মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে গবেষণার কাজে পুরীতে গেলে ও মা চিন্ময়ীর আশ্রমে গিয়ে ওঠে। ওই আশ্রমেরই সর্বাধ্যক্ষ গোস্বামীজি। খুব পণ্ডিত মানুষ। মহাপ্রভু সম্পর্কে নতুন কোনও তথ্য পেলেই উনি পাঠিয়ে দেন। সেসব ওর গবেষণার কাজে লাগে। দিনকাল পত্রিকায় একটা পাতা আছে অমৃতবাণী। তাতে ধর্মসম্পর্কিত প্রবন্ধ অথবা সাক্ষাৎকার বেরয়। গোস্বামীজি সেই পাতায় কখনও কখনও লেখা পাঠান।

খামটা খুলে ভিতর থেকে চিঠি বের করে আনল জয়দেব। গোস্বামীজির হাতের লেখা দেখে ওর মন ভরে গেল। একদম ছাপার অক্ষরের মতো। উনি লিখেছেন, 'অনেকদিন আপনার কোনও সংবাদ নাই। বাধ্য হইয়াই এই পত্র লিখিতেছি। আপনার পত্রিকার শেষ সংস্করণ পাইয়াছি। পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আপনার উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করি।

আপনার অবগতির জন্য জানাই, কেন্দ্রপড়াতে প্রাচীন একটি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি। তাহাতে মহাপ্রভু সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পুঁথিটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। যাঁহার হেফাজতে ইহা আছে, তাঁহার দাবি, পুঁথিটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত-র কয়েক বৎসর আগের লেখা। আমি কেন্দ্রপড়ায় যাইব, মনস্থ করিয়াছি। নিজের চক্ষে পুঁথিটি দেখিতে চাহি। তাহার পর, আপনাকে বিস্তৃত জানাইব।

সম্প্রতি ইন্টারনেট ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একটি বিদেশি পুস্তকের সন্ধান পাইলাম। ওই পুস্তকে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, মহাপ্রভু সমকামী ছিলেন। পুস্তকটি সম্পর্কে জানিয়া আমার মনে বড়ই ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে। মূর্খ ওই বিদেশি লেখক জানিবেন কী করিয়া, মহাপ্রভু রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন! মহাপ্রভুর বাহ্যিক আচরণ, সমকামিতার লক্ষণ হিসেবে ধরিয়া লওয়া, মূর্খতার সামিল। আমি ওই বিদেশি লেখককে একটি চিঠি লিখিতে চাহি। আপনি ওই পুস্তকের প্রকাশকের নিকট হইতে লেখকের ঠিকানা জোগাড় করিয়া দিলে, বিশেষ ধন্য হই।'

শ্রীক্ষেত্রে আবার কবে আসিতেছেন, জানাইবেন। শুভাশিসসহ অবধূত গোস্বামী।'

চিঠিটা পড়ে জয়দেব কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। গোস্বামীজি মারাত্মক চটেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা সময় উনি দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। মা চিন্ময়ীর সংস্পর্শে আসার পর চাকরি ছেড়ে আধ্যাত্মিক লাইনে চলে এসেছেন। খুবই আধুনিকমনস্ক। গত চার-পাঁচ বছরে জয়দেব, আশ্রমে অনেকটা সময় গোস্বামীজির সঙ্গে কাটিয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে একজন সোশ্যাল রিফর্মার ছিলেন, সে সম্পর্কে গোস্বামীজি ঘন্টার পর ঘন্টা ওর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পুরীতে যেসব জ্ঞানীগুণী চৈতন্যচর্চা করেন,



উনি তাঁদের অন্যতম। ওঁর সঙ্গে কথা বলে জয়দেবের মনে হয়েছে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে গোস্বামীজির থেকে বেশি বোধহয় আর কেউ জানেন না। উনি ইচ্ছে করলে, নিজেই এই বিষয়টা নিয়ে থিসিস জমা দিতে পারেন।

জয়দেব ঠিক করল, ঠান্ডা মাথায় এই চিঠির উত্তর দেবে। গোস্বামীজিকে লিখবে, কোন বিদেশি লেখক মহাপ্রভু সম্পর্কে কী লিখলেন, তা নিয়ে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। এই বইটি এখনও ভারতের বাজারে আসেনি। এই বিতর্কের মধ্যে আপনি ঢুকবেন না। বিতর্কটা বাণিজ্যিক কারণেই তোলা হয়েছে। এবং এতে প্রকাশকের স্বার্থ আছে। নিজে প্রকাশক বলেই জয়দেব জানে, এই বইটি বাজারে এলে কিছু কৌতূহলী পাঠক গোগ্রাসে গিলবেন। ভাল কাটতি হবে। কিন্তু লেখক ও প্রকাশকের দুর্ভাগ্য, বইটি কোনও লাইব্রেরিতে স্থান পাবে না।

গোস্বামীজির চিঠির অন্য অংশটাই বরং জয়দেবকে বেশি টানল। 'মহাপ্রভুর ওপর লেখা একটা প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।' মহাপ্রভু সম্পর্কে পড়াশোনা করার জন্য জয়দেব নিজে বেশ কয়েকবার ভুবনেশ্বরে স্টেট লাইব্রেরিতে গিয়েছে। প্রাচীন পুঁথি উল্টে-পাল্টে দেখেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তর্ধান পর্ব নিয়ে প্রামাণ্য তেমন কিছু পায়নি। তাঁর জীবনীকাররা একেকজন একেকরকম লিখেছেন। কেউ লিখেছেন, উনি 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলতে বলতে পুরীর সমুদ্রে নেমে যান। কেননা, সমুদ্রের রং শ্রীকৃষ্ণের গায়ের মতো নীল। কেউ লিখেছেন, পুরীর মন্দিরে গিয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথের মূর্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যান। আবার



কারও মতে, মহাপ্রভু রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে। তারপর ওঁর মরদেহ কোথাও সমাধিস্থ করা হয়। কেউ কেউ এও বিশ্বাস করেন, মহাপ্রভু আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, নিজেই গোপনে পালিয়ে আসেন গৌড়ে। নদিয়ার কোনও এক স্থানে তিনি দু'শো বছরেরও বেশি বেঁচেছিলেন।

জয়দেব এরকম বহু তথ্য জোগাড় করেছে। কিন্তু এখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি, কীভাবে মহাপ্রভুর জীবনাবসান হয়েছিল।

'জয়দা, আমাকে ডেকেছেন?'

কৌশিকের গলা শুনে জয়দেব ওর দিকে তাকাল। ছেলেটা এত লম্বা, ওপরে এলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সিলিং-এ ওর মাথা ঠেকে যায়। তাই তাড়াতাড়ি ও বলল, 'চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো। তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা করার আছে।'

চেয়ারে বসে কৌশিক বলল, 'সিরিয়াস কিছু জয়দা?'

জয়দেব বলল, দিনকাল-এর লাস্ট ইস্যুর কত কপি রিটার্ন এসেছে, জানো? প্রায় তিন হাজার। প্রতি ইস্যুতেই ঘাটতি। ক'দ্দিন পত্রিকাটা চালাতে পারব, জানি না।'

কৌশিক চমকে উঠে বলল, 'এই কথাটা মাথাতেই আনবেন না জয়দা। শুরু থেকে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছি। লাভ-লোকসানের কথা কখনও ভাবিনি। বাজারে একটা গুডউইল তৈরির কথাই শুধু ভেবে গিয়েছি। এখন সেটা হয়েছে। সেটাই বা কম কীসে। এবার লাভের কথা চিন্তা করতে হবে। বিজ্ঞাপন আনার জন্য আপনি শুধু একটা এফিসিয়েন্ট লোককে রাখুন। মানে... অন্য ম্যাগাজিনগুলো যেভাবে চলে, সেভাবেই আমাদের চলতে হবে।'

'তোমার জানাশোনা এমন লোক আছে?'

'আমার এক বন্ধু আছে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' বলে চুপ করল কৌশিক। তারপর বলল, 'আমি বুঝতে পারছি জয়দা, পত্রিকার চক্করে পড়ে আপনার রিসার্চের কাজ আটকে যাচ্ছে। সেই কারণেই...বন্ধ করার কথা ভাবছেন। আপনি এক কাজ করুন, আমার আর সুমিতার ওপর খানিকটা দায়িত্ব ছেড়ে দিন। আমরা চালিয়ে নিতে পারব। দরকার হলে আপনি তো মাথার ওপর আছেনই। আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারেন।'

জয়দেব বলল, 'তুমি যা ভাবছ, তা নয়। তোমাদের ওপর ভরসা করেই তো পত্রিকাটা চালাচ্ছি। আচ্ছা, বলো তো...কেন আমাদের তিন-চার হাজার কপি আনসোল্ড থাকছে?'

'জয়দা, এটা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যুগ। ঘরে বসে টিভিতে লোকে সবকিছু দেখা ও জানার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এর জন্য তাকে আলাদা খরচা করতে হচ্ছে না। হকারদের সেন্টারে গিয়ে মাঝে মাঝে আমরা কথা বলি। পাঠকদের মতামতও জানার চেষ্টা করি। এখন ম্যাগাজিন চালানো এত সহজ নয়। জানতে চাইলেন বলেই বলছি, দিনকাল-এর প্রতি ইস্যুতে এমন কোনও মেটিরিয়াল আমাদের দিতে হবে, যা পাঠকরা অন্য কোথাও পাবে না। ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট—কোনও মিডিয়াতেই না। আমি সেনসেশনাল স্টোরির কথা বলছি। দরকার হলে, এই ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে জয়দা।'

'কিন্তু প্রতি সংখ্যায় ওই ধরনের স্টোরি তুমি পাবে কোথায় কৌশিক?'

'সুমি অনেক খোঁজখবর রাখে। অনেক সময় আমাকে বলেও। তিনজনে একসঙ্গে বসে আলোচনা করলেই দেখবেন, ঠিক বেরিয়ে আসবে। মাসে একটা করে পাব না, তা হয় নাকি?' কৌশিক কথাটা বলার সময়ই সিঁড়ির গোড়ায় সুমিতার মুখটা দেখা গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ও হাসিমুখে বলল, 'কৌশিকটা আমার নামে কী চুকলি কাটছে জয়দা?'

জয়দেব হেসে বলল, 'চুকলি কাটেনি। বরং তোমার প্রশংসাই করছিল। এসো, বসো।'

বলতে বলতেই ও দেখল, সুমির হাতে একটা বাদামি রঙের প্যাকেট। সেটা এগিয়ে দিয়ে সুমি বলল, 'এই নিন জয়দা, আপনার প্যাকেট। এখুনি কুরিয়ারের লোক দিয়ে গেল।'

নিশ্চয়ই সুশোভনদার প্যাকেট। ওপরে লেখা, ডু নট ফোল্ড। তার মানে ভিতরে এমন কিছু আছে, ভাঁজ করলে নষ্ট হয়ে যাবে। সুশোভনদা একটা ছবির কথা বলেছিলেন। ওঁর লেখার সঙ্গে সেই ছবিটা ছাপতে হবে। তা হলে সেই ছবিটাই এর ভিতরে রয়েছে। কাঁচি দিয়ে সাবধানে জয়দেব প্যাকেটটা খুলে ফেলল। তারপর ভিতরকার কাগজগুলো বের করে আনল। সবার ওপরে রয়েছে সুশোভনদার চিঠি। তারপর কয়েক পাতার লেখা। একদম নীচে একটা পিচবোর্ডের ওপর রাখা আছে রঙিন ছবি।

ছবিটা দেখে জয়দেব লাফিয়ে উঠল। লেখাটা প্রথমেই দ্রুত পড়ে ফেলল ও। তারপর কৌশিককে বলল, 'একটু আগে তুমি সেনসেশনাল স্টোরির কথা বলছিলে না? দেখো, ভগবান আছেন। এই যে, সুশোভনদা একটা লেখা পাঠিয়েছেন। এই স্টোরি নিয়ে হইচই পড়ে যাবে। সুমি, প্রেসে কি গল্পটা তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ? পাঠালে ওদের ফোন করে বলে দাও, কম্পোজ করতে হবে না। তুমি এই লেখাটা নিজে প্রেসে নিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে কম্পোজ করাবে। এটাই দিনকাল-এর নেক্সট ইস্যুর কভারস্টোরি হবে। আর একটা কথা, ইস্যু বেরনোর আগে কেউ যেন স্টোরিটার কথা জানতে না পারে, বুঝলে?'

পরের এপিসোড আগামী রোববার
অলংকরণ শান্তনু দে

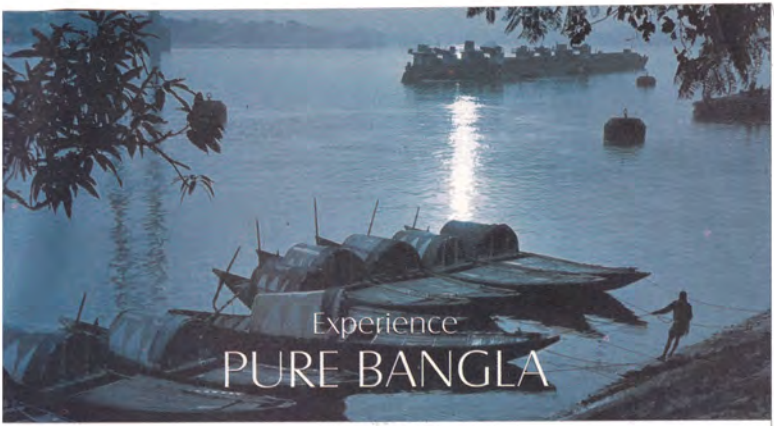


শুরু হল নতুন কলাম। ব্র্যান্ডবাদশার নামরহস্য

'ব্লু রিবন স্পোর্টস' রাতারাতি খুইয়েছিল তার নাম। নাম হয়ে গেল 'নাইক'। আহ্লাদ করে যাকে সবাই ডাকে, 'নাইকি'। গ্রিক দেবী নাইক, যাঁর প্রতীক 'জয়'—তাঁর নামেই কোম্পানির নাম। ব্লু রিবন স্পোর্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা ফিলিপ এইচ নাইট। পেশায় তিনি একজন দৌড়বীর। ইউনিভার্সিটি অফ অরিগন থেকে ডিগ্রিও পেয়েছেন। পাশাপাশি হাতেকলমে ব্যবসা শিখবেন বলে, স্ট্যানফোর্ড বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ পড়া শেষ করে, পাড়ি দেন জাপানে। 'ওনিটসুকা টাইগার' শু কোম্পানির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বলেন, তিনি জুতোর ব্যবসা শুরু করতে চান। নিজের পরিচয় দেন খেলাধুলোর জুতো সরবরাহকারী এক মার্কিন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে। যা তিনি একেবারেই ছিলেন না। সবটাই ঘটে যাচ্ছিল শুধুমাত্র খেলাচ্ছলে, এমনি এমনি। তারপর সত্যি সত্যি কোচ বিল বোয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬৪ সালে ওনিটসুকা টাইগার কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নিয়ে জুতো বিক্রি করতে শুরু করেন। সংস্থার নাম দেন 'ব্লু রিবন স্পোর্টস'। দু'বছর পরে ফিলিপ এবং বোয়ারম্যান ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মনিকায় পিকো বুলেভার্ড-এ খোলেন তাঁদের প্রথম রিটেল শপ। ১৯৭১ সাল নাগাদ ওনিটসুকা টাইগার কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কের রং ফিকে হয়ে আসে। স্বতন্ত্র জুতো উৎপাদনকারী সংস্থা হিসেবে ব্যবসা শুরু করে ব্লু রিবন স্পোর্টস। এবং এ বছরই, একদিন রাতে গ্রিক জয়ের দেবী নাইক-কে স্বপ্নে দেখেন জনসন। পরদিন তাঁর দেওয়া কোম্পানির নতুন নাম 'নাইক' ফিলিপ আর বোয়ারম্যানের পছন্দ হয়ে যায়। নাইক নামাঙ্কিত প্রথম 'সকার শু' বাজারে আসে ১৯৭২-এ। জুতোর গায়ে বসে নাইক সুশ (swoosh) লোগো। এই লোগো তৈরি করেছেন গ্রাফিক ডিজাইনার ক্যারোলিন ডেভিডসন। তিনি ছিলেন পোর্টল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞাপন বিভাগের ছাত্রী।

ফিলিপের কোম্পানির জন্য ছুটকোছাটকা কিছু কাজ করতেন। ফিলিপই একদিন প্রস্তাব দেন তাঁর কোম্পানির লোগো তৈরির জন্য। মাত্র ৩৫ ডলারের বিনিময়ে ক্যারোলিন তৈরি করে দেন নাইক সুশ লোগো। প্রথম প্রথম ১৯৭১-এ নাইক নামের ওপরই বসত এই লোগো, তারপর '৭৮-এ নাইক উঠে আসে লোগোর ওপর। লোগো ছোট হতে থাকে। ১৯৮৫-তে একটা চৌকো বাক্সের মধ্যে বসে নাইক লোগো। ১৯৮৮ সালে প্রচলিত হয় নাইকের স্লোগান, 'জাস্ট ডু ইট'। ১৯৯৫-এ লোগোর ওপর থেকে নাইক নামটাই উঠে যায়। কারণ এই নামের আইনত দাবিদার ছিল স্পেনের একটি কোম্পানি। কিন্তু এই লোগোর মাহাত্ম্যই এমন, দেখলেই লোকে কোম্পানির নামটা মনের মধ্যে শুনতে পায়। আর, নাম বাদ দিয়ে, দোকানের বা জুতোর ওপর শুধু একটি দুরন্ত চিহ্নের ব্যবহারের যে তুখোড় স্মার্টনেস, সেটাও এই প্রজন্মকে সম্মোহিত করে।

রিংকা চক্রবর্তী



Experience
GLOBAL LIVING

Kolkata West International City, an integrated township project on 400 acre at West Howrah.
Phase-1 comprising of bungalows. Each unit encloses landed home, garden area, own terrace and car-parking space.

• Modern Club with all club facilities • International standard school
• Retail & Commercial complex • Community centre • A fully equipped Medical Centre
• Parks & children's play area



Units ranging from 1,050 sq.ft. to 4,500 sq.ft.

KOLKATA WEST
INTERNATIONAL CITY

www.kolkatawest.com • sales@kwic.co.in

Joint developers

SALIM

USE
Universal Success Enterprises


taste elegance
SEAGRAM'S
BLENDERS PRIDE
MAGICAL NIGHTS
Music CDs Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
the new look Blenders Pride